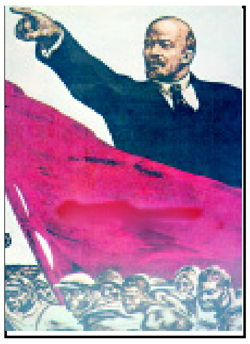

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

বিশেষ পঞ্চম ই-সংস্করণ, অক্টোবর '২০২০ ■ ৪৮তম বর্ষ

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও সদা সক্রিয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

বাঁকুড়া

নদীয়া

পূর্ব মেদিনীপুর

বর্ধমান

উত্তর ২৪ পরগনা

কাকদ্বীপ

ধর্মঘটের দেওয়াল লিখন (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

পুরুলিয়া

জুন মাসে আনলক পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকেই এমন একটা দিনও নেই, যেদিন রাস্তায় নামেনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

সাধারণ সম্পাদকের আবেদন

২৬ নভেম্বর ধর্মঘট সফল করুন

আগামী ২৬ নভেম্বর, অর্থাৎ শারদোৎসব, দীপাবল সহ বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবে। সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি, আই এন টি ইউ সি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন যৌথভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। গত ২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এক কনভেনশন থেকে এই সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যদিও কোভিড-১৯ প্যানডেমিকের কারণে এবারের কনভেনশনটি 'ভার্চুয়াল' পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই ভার্চুয়াল কনভেনশনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছাড়াও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন জাতীয় ফেডারেশনগুলিও অংশ নিয়েছিল। এবং তারাও এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের শরিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবাংলা সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনের সাথে যুক্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সর্বভারতীয় সংগঠন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনও অন্যান্য জাতীয় ফেডারেশনগুলির মতো সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের শরিক এবং সেই মোতাবেক ফেডারেশনের অ্যাফিলিয়েটেড রাজ্য ভিত্তিক সংগঠনগুলির কাছে স্ব স্ব রাজ্যের প্রশাসনের অভ্যন্তরে ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ বিভিন্ন বোর্ড কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারীদের আবৃত করা সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং যুক্ত কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল ও স্টিয়ারিং কমিটি—এই চারটি সংগঠনেরই সর্বভারতীয় ফেডারেশনের অ্যাফিলিয়েশন রয়েছে। স্বভাবতই রাজ্য প্রশাসন সহ রাজ্য সরকার পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী বন্ধুদের এই ধর্মঘটে শামিল করার জন্য এই চারটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ ও যৌথ প্রচারের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। এরই প্রথম ধাপ হিসেবে আগামী ৯ নভেম্বর এই চারটি সংগঠন একসাথে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করবে। একই দিনে জেলা শাসকদের কাছে নোটিশের অনুলিপি প্রদান করা হবে। নোটিশ প্রদানের দিন থেকেই সারা রাজ্যে, একেবারে ব্লক স্তর পর্যন্ত ধর্মঘটের দাবিগুলি নিয়ে নিবীড় প্রচার শুরু হবে। যার সূচনা হবে ঐদিন দুপুরে টিফিন বিরতিতে কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনে, প্রতিটি জেলায় জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এবং মহকুমা ও ব্লক স্তরে ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রচারের মধ্য দিয়ে। ঐ দিনই সন্ধ্যা ৬টায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ সভা। যেখানে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব গ্রহণ হবে। একই সাথে সারা রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরে প্রচারপত্র বণ্টন, স্কোয়াড, কর্মী সভা ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মঘটের দাবিগুলি কর্মচারী বন্ধুদের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াকেও প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হবে।

করোনা পরিস্থিতির কারণে শারীরিক দূরত্ব বিধিকে মান্যতা দিয়ে রাজ্যের অধিকাংশ দপ্তরে প্রতিদিন কর্মচারীদের উপস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। এছাড়াও রয়েছে দীপাবলী সহ একাধিক ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানের ছুটি। স্বভাবতই নিবীড় প্রচার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগুলি কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও ধর্মঘটকে সফল করার জন্য সর্বোচ্চ সাংগঠনিক উদ্যোগই গ্রহণ করা হবে। চেষ্টা করা হবে, যাতে প্রত্যেক কর্মচারী বন্ধুর কাছে ধর্মঘটের দাবিগুলিকে পৌঁছে দেওয়া যায়।

সাধারণ ধর্মঘটে সফল করার জন্য যে বিশেষ সাংগঠনিক উদ্যোগ ও যৌথ প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা সংগঠনের কাছে কোনো নতুন বিষয় নয়।

১৯৯১ সালে আমাদের দেশে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত যে ১৯টি সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে, তার প্রত্যেকটিকে সফল করার জন্য সংগঠনের উদ্যোগের কখনোই কোনো ঘটতি ছিল না। কারণ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার জন্মলগ্ন থেকেই 'ধর্মঘট'-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। তা সে সাধারণ ধর্মঘটই হোক বা রাজ্য কর্মচারীদের নিজস্ব দাবি দাওয়া ভিত্তিক ধর্মঘট হোক। ধর্মঘটের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধিই, সংগঠনকে শ্রমজীবীদের স্বার্থে আহূত ধর্মঘটকে সফল করার উদ্যোগে শামিল হওয়ার প্রেরণা যোগায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সঠিক উপলব্ধিটি কী? এর উত্তরে খুব সংক্ষেপে বলতে হলে বলা যায়, পুঁজির অমানবিক শোষণ, মোট উৎপাদন মূল্যে মজুরির অংশ হ্রাস, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী নীতিসমূহে, শ্রমজীবীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং আর্থিক দাবিসহ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্জনের প্রশ্নে ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের চূড়ান্ত ও সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার। ধর্মঘট সম্পর্কে এই স্বচ্ছ উপলব্ধিই যে কোনো সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নের মতোই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিরও বৈশিষ্ট্য।

ধর্মঘটের পক্ষে যখন শ্রমজীবীদের বিভিন্ন সংগঠন প্রচার শুরু করে, তখন ধর্মঘট বিরোধী প্রচারও দানা বাঁধতে থাকে। ধর্মঘট মানে কর্মনাশা, ধর্মঘট মানে একদিনে কয়েক লাখ শ্রমদিবস নষ্ট হওয়া, ধর্মঘট মানে দিন আনি দিন খাই মানুষের রুটি-রুজি বন্ধ, ধর্মঘট মানে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় বিভ্রাট (যদিও তা হয় না, কারণ স্বাস্থ্য ক্ষেত্র জরুরি পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত এবং ধর্মঘটের আওতার বাইরে) ইত্যাদি নেতিবাচক প্রচারের মাধ্যমে ধর্মঘটীদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের নেতিবাচক প্রচার বিশ্বায়ন পর্বে বাড়তি গতি লাভ করেছে। এর কারণও রয়েছে। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র শ্রমজীবীদের ধর্মঘটের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ফলে সেক্ষেত্রে প্রাক ধর্মঘট দরকষাকষির সুযোগ বা ধর্মঘট সম্পর্কে কিছুটা হলেও সহনশীল মনোভাব থাকতো। কিন্তু বিশ্বায়ন পর্বে রাষ্ট্রের জনকল্যাণকামী ভূমিকা অনেকটাই দুর্বল। ব্যক্তিপুঁজিই আধিপত্যকারী শক্তি। আর জনকল্যাণ নয়, মুনাফাই ব্যক্তিপুঁজির একমাত্র লক্ষ্য। তাই মুনাফার তাড়নায় হিংস্র হতেও ব্যক্তিপুঁজির আপত্তি নেই (যেমনটা কার্ল মার্কস বলেছিলেন)। তাই কোনো একটি শিল্প সংস্থায় ধর্মঘট ভাঙার জন্য একদিকে ছাঁটাই-এর জুজু দেখানো হয়, অন্যদিকে ভাড়াটে বাহুবলীদের লেলিয়ে দেওয়া হয় ধর্মঘটীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য। কিন্তু সাধারণ ধর্মঘটের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা পালন করা ব্যক্তি পুঁজির পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও রূপায়ণের দায়িত্বে থাকে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার। সাধারণ ধর্মঘটকে বিফল করার জন্য তাই ব্যক্তি পুঁজি সরকারের মুখাপেক্ষী হয়। সরকার বলতে এক্ষেত্রে কিন্তু মূলত রাজ্য সরকারকেই বোঝানো হচ্ছে। কারণ 'আইন-শৃঙ্খলা' রাজ্যের এক্তিয়ার ভুক্ত। এখন রাজ্য সরকার ব্যক্তি পুঁজির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ধর্মঘট বিরোধী ভূমিকা পালন করবে কিনা, তা নির্ভর করে শাসকদলের শ্রেণী আনুগত্যের ওপর। আমাদের রাজ্যে ২০১১ সালের আগে ও পরে আহূত ধর্মঘটগুলিতে যে বিপরীত অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, তার কারণই এই শ্রেণী আনুগত্যের পার্থক্য। স্বভাবতই অতীতেও প্রতিটি ধর্মঘটে এই নেতিবাচক সমস্ত উপাদানকে মোকাবিলা করেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ধর্মঘট

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

আসন্ন বিশতম সাধারণ ধর্মঘট ও তার সুদীর্ঘ প্রেক্ষিত

গত শতাব্দীর আশির দশকের গোড়া থেকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল কেন্দ্রগুলি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উন্নত দেশসমূহ) কেইন্সীয় প্রভাব বলয় থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে, 'ওয়াশিংটন কনসেনশাস'-এর হাত ধরে মুক্ত বাজার অর্থনীতির জয়গান শুরু করে। রোনাল্ড রেগান, মার্গারেট থ্যাচার প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কদের সামনে রেখে এই প্রচার শুরু হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির অনিবার্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার 'দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ' বা 'টিনা'-র স্লোগান জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মাতব্বরদের এই উদ্যোগে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ে বহুজাতিক পুঁজি, যাদের আঁতুরঘর ঐ সমস্ত দেশেই। তারা হাত-পা ছুঁড়ে বায়না করতে শুরু করে, শুধু মুক্ত বাজারের কথা বললেই হবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পণ্য, পরিষেবা ও পুঁজির অবাধ চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রেগান-থ্যাচার-হেলমুট কোহলের এত প্রতিপত্তি, সেই আদরের দুলালদের আবদার ফেলা যায় কী করে? তাই 'গ্যাট' নামক সংস্থাটির অষ্টম রাউন্ডের বৈঠকে সাধারণ আলোচ্যসূচীর সাথে যুক্ত হয় এই নতুন বিষয়গুলি। আর্থার ডাঙ্কেল নামক জনৈক আইন বিশারদকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব রচনা করার জন্য। ডাঙ্কেল সাহেব এক সুবিশাল প্রস্তাব তৈরি করেন, যার ভিত্তিতে 'গ্যাট'-এর অষ্টম রাউন্ডের বৈঠকে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। উন্নত ধনতান্ত্রিক দুনিয়া বনাম উন্নয়নশীল দেশসমূহের দ্বন্দ্বের কেন্দ্র হয়ে ওঠে 'গ্যাট' বৈঠক।

একদিকে যখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতিনিধিরা ডাঙ্কেল প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে তাদের ওজর আপত্তি তুলে ধরার চেষ্টা করছে, তখন অন্যদিকে মুক্তবাজার অর্থনীতি তথা বিশ্বায়নের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে। পরিণতিতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। 'মেক্সিকান ডিসেস্টার' তো সেই সময় বিশ্বায়নের পরিণতির 'কয়েনেজ'-এ পরিণত হয়েছিল। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারা, বিশেষত 'ইন্টেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি রাইটস্' নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে, মেক্সিকো এবং আর্জেন্টিনা সহ লাতিন আমেরিকায় আরও কয়েকটি দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় যখন 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি' বা 'বিশ্বায়ন'-এর যৌক্তিকতা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে, ঠিক সেই সময়েই পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা পরিকল্পিত অর্থনীতির বিপর্যয় ঘটে গেল। প্রায় একই সময়ে সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানি এবং ধনতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানির বিভাজনকারী বার্লিন ওয়ালের পতন ঘটলো। জার্মানির একীকরণের নামে ধনতন্ত্র সমগ্র জার্মানিকে গ্রাস করলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে বিস্তার ঘটেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের বিপর্যয় তার পরিসরকে সঙ্কুচিত করে চীন, ভিয়েতনাম, লাওস, উত্তর কোরিয়া ও কিউবার মতো হাতে গোনা কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ করে ফেলল।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বৃহৎ শক্তির অবলুপ্তিতে স্বভাবতই উল্লসিত হয়ে উঠলো বহুজাতিক পুঁজি এবং রেগান ও থ্যাচারের মতো সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মাথারা। জাপানী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা লিখে ফেললেন 'এন্ড অফ হিস্ট্রি'র তত্ত্ব। অর্থাৎ সমাজ বিবর্তনের সর্বোচ্চ তথা শেষতম ধাপ হলো পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণের (উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা) প্রচেষ্টা (নভেম্বর বিপ্লব) ছিল না কি ইতিহাসের ভ্রান্তি। এক কথায় ফুকুয়ামা সাহেব তাঁর তত্ত্বের মোড়কে যে বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইলেন, তা হলো, পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থাই হবে চিরস্থায়ী। এর কোনো বিকল্প নির্মাণের উদ্যোগ না কি মানব ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথকে বিকৃত করার সমতুল।

বিশ্বায়নের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ব্যর্থতাকে আড়াল করে তুমুল প্রচার শুরু হল সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় নিয়ে। নভেম্বর বিপ্লব উত্তর সাত দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অর্থনৈতিক ও সামরিক বৃহৎ শক্তির সাথে সমস্ত দিক থেকে পাল্লা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন, ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাজিত করার প্রশ্নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে (আমাদের দেশ সহ) ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে দিশা প্রদর্শন প্রভৃতি সবকিছুকে আড়াল করে একপেশে তীব্র প্রচার শুরু হলো সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আবার শুধুমাত্র প্রায়োগিক স্তরে এই প্রচার সীমাবদ্ধ থাকলো না। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের সোভিয়েত মডেল ব্যর্থ হয়েছে, কেন হয়েছে ইত্যাদি নিয়ে কাঁটাছেড়া চললে তার একটা মানে বোঝা যেত। কারণ এর ফলে একটা সুস্থ বিতর্কের বাতাবরণ তৈরি হতো। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাযুজ্য রেখে, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মৌলিক চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেত। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে যারা সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন, সেই গরবাচ্যভ বা ইয়েলেৎসিনও কিন্তু সংস্কারের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রস্তাবিত 'গ্লাসনস্ত' ও পেরেস্ত্রৈকা ছিল সমাজতন্ত্রের মৌলিক চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করে ভিতটাকেই দুর্বল করে দেওয়ার দাওয়াই।

কিন্তু সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করে, তাকে সংশোধনের পথে নিয়ে যাওয়া তো সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের লক্ষ্য ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দৈত্যাকার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ডলার (যার একটা বড় অংশ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির পেট্রো-ডলার)-এর যথেচ্ছ গমন ও বিনিয়োগের জন্য (উৎপাদনমূলক ও ফাটকা কারবারে) পৃথিবীব্যাপী মুক্তাঞ্চল গঠন। কিন্তু লগ্নীপুঁজির অবাধ চলাচলের পথে বাধা ছিল তিনটি—(১) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি (ভারতসহ যে দেশগুলির বাজার ছিল লগ্নীপুঁজির প্রাইম টার্গেট) তখন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণায় এক ধরনের জনকল্যাণকামী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। যেখানে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, (২) সমাজতন্ত্রের প্রেরণায় প্রণীত শক্তিশালী শ্রম আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষের বিপুল বাহিনী, যারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় সমৃদ্ধ এবং (৩) এই সমস্ত দেশের আন্তঃসহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা জোট নিরপেক্ষ শিবির।

এই তিনটি বাধাকে অপসারণ করে এগোতে হলে, শুধুমাত্র সোভিয়েত মডেলকে আক্রমণ করাই যথেষ্ট ছিল না। সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের ধারণাটিকেই ইতিহাসের বিস্মৃত পর্বে পরিণত করার জন্য এর যে আদর্শগত ভিত্তি সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকেই আক্রমণ করা প্রয়োজন। সরাসরি ও ঘুরপথ এই দুই কৌশলে শুরু হলো আক্রমণ। কেউ মার্কসকে তুলোধোনা করলেন। কেউ আবার কায়দা করে বললেন, মার্কসের দোষ নেই, লেনিনই মার্কসবাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। সর্বোপরি এলেন পোস্ট মডার্নিস্টরা। বিভিন্ন জটিল শব্দের আড়ালে এরা আবার 'শ্রেণী'-র ধারণা যা মার্কসবাদের অক্ষ, তাকেই বাতিল করার তত্ত্ব আওড়াতে শুরু করলেন।

কিন্তু মার্কসবাদের মতো বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী একটা মতাদর্শকে গলার জোরে বাতিল বললেই তো চলবে না। এর ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে সেখানে বিকল্প মতাদর্শ দিয়ে ভরাট করতে হবে। যাতে শ্রমজীবী মানুষ প্রাথমিক হতচকিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আবার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নিরিখে মার্কসবাদকে আঁকড়ে না ধরে। তাই বিভিন্ন চেহারার বিকল্প মতাদর্শ বা জীবন দর্শন গুঁজে দেওয়া হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাময়িক পিছু হঠায় সৃষ্ট শূন্যস্থানে। পোস্ট মর্ডানিস্টদের কথা আগেই বলা হয়েছে। যারা শ্রেণীকে ভেঙে বিভিন্ন পরিচিতি সত্তার ভিত্তিতে (ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ ইত্যাদি) শ্রমিক শ্রেণীকে টুকরো টুকরো দলে (অমিত শাহর টুকরো টুকরো গ্যাং নয়)-এ পরিণত করতে চাইলেন। এছাড়াও তৎপর হয়ে উঠলো প্রাগৈতিহাসিক ভাবনায় জারিত বিভিন্ন চেহারার মৌলবাদীরা। এদেরই জারজ সন্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো বিভিন্ন সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। সর্বোপরি ভোগবাদ বা কনসিউমারিজম নামক এক ঔষধ নিয়ে আসা হলো, যা মানুষের চেতনাকে নিদ্রাচ্ছন্ন করে রাখবে। নব্বই-এর দশকজুড়ে এসব কিছুর মিলিত অভিঘাতে কার্যত 'সুনামি' সৃষ্টি হলো বিশ্ব রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিতে।

উপরিকাঠামোর স্তরে যখন এই ধরনের বি-নির্মাণ ও নির্মাণ চলছে (পোস্ট মডার্নিস্টদের কথা অনুযায়ী) তখন ভিত্তি অর্থাৎ অর্থনীতিতে এলো স্ট্রাকচারাল রিফর্মস, 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট', 'এল পি জি (লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন ও গ্লোবালাইজেশন)-এর নিদান।

লাতিন আমেরিকার পর বিশ্বায়নের পরীক্ষাগার হয়ে উঠলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি ছোটো দেশ। কিছু সাময়িক সাফল্য ঘিরে শুরু হলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার। নাম দেওয়া হলো 'এশিয়ান টাইগারস'। কিন্তু অচিরেই পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম মেনেই মুখ থুবড়ে পড়লো এশিয়ান টাইগাররা। এদিকে সোভিয়েত উত্তর মতাদর্শগত বিভ্রান্তির (এজ অব কনফিউশন) অনুকূল বাস্তবতায়, বহুজাতিক লগ্নীপুঁজি তখন আঁতুড় ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে বেশি আগ্রহী। কারণ বাইরের বিশাল অব্যবহৃত বাজার, সস্তা কাঁচা মাল ও শ্রম। কিন্তু এর ফলে সঙ্কট তৈরি হলো লগ্নীপুঁজির ধাত্রী দেশগুলির অভ্যন্তরেই। শুরু হলো উন্নত দেশগুলির অভ্যন্তরে জনবিক্ষোভ। সিয়াটেল থেকে জেনোয়া ছড়িয়ে পড়ল সেই বিক্ষোভ। যেখানেই বহুজাতিক পুঁজির মাথারা অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রনেতারা মিলিত হন, সেখানেই মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলো। ইতালির জেনোয়ায় বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ কার্লো গিউলিয়ানির কথা আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাই নি। বিশ্বায়নের কুফল যে শুধু সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুললো তা নয়, এমনকি বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যাঁরা শুরুতে বিশ্বায়নের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পুনর্বিবেচনা শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নোবেল জয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ। পুঁজিবাদের মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের এই প্রাক্তন উপদেষ্টা লিখে ফেললেন, তাঁর পরিবর্তিত উপলব্ধি— 'Globalisation and Its Discontent'। যদিও এঁদের প্রাথমিকভাবে উপদেশ ছিল, বিশ্বায়ন থাকুক, কিন্তু তাঁকে একটা মানবিক মুখ দেওয়া হোক। অপর এক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ এবং আমাদের গর্ব অমর্ত্য সেনও ঐ সময়ে একই মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু মানুষের ক্ষোভ, বিশেষজ্ঞদের অভিমত কোনোটিই লগ্নীপুঁজি মানতে নারাজ। কারণ পুঁজির কাছে পাখির চোখ তখন আবিশ্ব বিশাল বাজার। প্রবেশ পথে বাধা শুধু বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের প্রাচীর। বিভিন্ন কৌশলে সেগুলিকে ভেঙে ফেলতে পারলেই পুঁজির পৌষমাস (মানুষের সর্বনাশ এটা উহ্য)। রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের প্রাচীর ভাঙতে হলে বিভিন্ন কৌশলে চাপ দেওয়া প্রয়োজন। এই চাপ সৃষ্টির জন্য পুরোনো দুটি প্রতিষ্ঠান আই এম এফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক তো ছিলই, তার সাথে ততদিনে গ্যাটের অষ্টম রাউন্ডে দীর্ঘ বাকবিতন্ডার পর গড়ে উঠেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ টি ও)। এই ত্রয়ীর চাপেও যদি কাজ না হয়, যদি কোনো দেশের শাসক দল বেয়ারাপনা (?) করে চাপের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে দেশের মধ্যেই শাসক বিরোধী প্রতিবিপ্লবকে মদত দাও। নাছোরবান্দা শাসককে সরিয়ে জো-হুজুর শাসককে বসানোর এই খেলার নাম কোথাও দেওয়া হলো, 'পিঙ্ক রেভেলিউশন' আবার কোথাও 'অরেঞ্জ রেভিলিউশন'।

বিশ্ব পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৯১ সালে এল পি জি আনুষ্ঠানিকভাবে থাবা বসালো ভারতীয় অর্থনীতিতে। কেন্দ্রে তখন জাতীয় কংগ্রেসের সরকার। দেশের অর্থমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হলো এমন একজন ব্যক্তিকে, যাঁর অর্থশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকলেও, ভারতীয় রাজনীতির সাথে কস্মিনকালেও তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি অর্থাৎ ডঃ মনমোহন সিং ছিলেন, বিশ্ব ব্যাঙ্ক নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তন আধিকারিক।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশের যে পথ গ্রহণ করা হয়েছিল (মিশ্র অর্থনীতি, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র) তা ছিল সোভিয়েত মডেল দ্বারা অনুপ্রাণিত (পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিউপনিবেশকরণ প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দীর্ঘ চার দশক সময়কালে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া, বহু সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও অনেকদূর এগিয়েছিল। নব্বই-এর দশকে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট, নয়া শিল্পনীতি ইত্যাদি পোশাকি নামের আড়ালে লগ্নীপুঁজির প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী মানুষের শ্রম আর অর্থে তিল তিল করে গড়ে ওঠা বিপুল রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথম প্রজন্ম, দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার ইত্যাদি নামে ধাপে ধাপে এগোতে শুরু করলো লগ্নীপুঁজির স্বার্থবাহী সংস্কার প্রক্রিয়া।

এই প্রসঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য, তা হলো, এই বিশ্বায়নপন্থী তথাকথিত সংস্কার প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু থেকেই আইনসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এর কারণ হলো আমাদের দেশে মূল ধারার কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সহ বামপন্থী দলগুলির রাজনৈতিক প্রভাব সারা দেশে যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর বিভিন্ন ধারার মতাদর্শগত আক্রমণ বা বিশ্বায়নপন্থী ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রসার প্রভৃতি কোনো কিছুই তাদের আদর্শগত অবস্থান থেকে টলাতে পারেনি। ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যখন সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে দিশাহারা হয়ে নিজেদের ভোল পাল্টে ফেলেছে, তখন এদেশের সাম্যবাদী দলগুলি কিন্তু দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে, সমাজতন্ত্রের কোনো একটি বিশেষ মডেলের বিপর্যয়ের কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারায় পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক ধারণাটি নস্যাৎ হয়ে যায় না। সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের প্রশ্নে কোনো ধোঁয়াশা না থাকার কারণেই, সংখ্যাগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সংসদের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী শোষণের নয়া বিশ্বায়ন মডেলের স্বরূপ উন্মোচন শুরু থেকেই বামপন্থীরা সফলভাবে করতে পেরেছিলেন। পাশাপাশি লাতিন আমেরিকা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা তো ছিলই। সংসদের বাইরে বামপন্থী বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনগুলিও প্রতিরোধ-সংগ্রামে শামিল হতে দেরি করেনি। তাই ১৯৯১ সালেরই নভেম্বর মাসে আহূত হয় প্রথম সর্বভারতীয় ধর্মঘট। পরবর্তী তিন দশকে শাসক শ্রেণী যেমন তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে সরে আসেনি, তেমনই শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবীদের সংগ্রাম-আন্দোলন ও ধর্মঘটও থেমে যায়নি। মূলত দুটি ধারায় এগুলি পরিচালিত হয়েছে—ক্ষেত্রভিত্তিক এবং সাধারণ চরিত্রের। এই পথ বেয়েই ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিশতম সাধারণ ধর্মঘট।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোচ্য সময়পর্বে সংসদের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের শক্তি কখনও বৃদ্ধি, আবার কখনও হ্রাস পেলেও, সংগ্রাম-আন্দোলন ধর্মঘটের ব্যাপকতা কিন্তু ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পেয়েছে। প্রথমদিকে এগুলির প্রভাব সারা দেশে সমভাবে অনুভূত না হলেও, যত সময় গড়িয়েছে, ততই এর প্রসার ঘটেছে। ২০০৮-২০০৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত সাধারণ ধর্মঘটগুলি কার্যত আসমুদ্র-হিমাচল সর্বভারতীয় চরিত্রই অর্জন করেছে। ধর্মঘটের এই ব্যাপকতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, শুরু থেকেই বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির দৃঢ় অবস্থান, বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও এই লড়াইয়ের বৃত্তে টেনে এনেছে। কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস দলের শাসন, তখনও কংগ্রেস প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন আই এন টি ইউ সি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে শামিল হয়েছে। আজও এই সংগঠনটি ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের অংশীদার। আর এস এস পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন ভারতীয় মজদুর সংঘও একসময় এই লড়াইয়ে শামিল হয়েছিল। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, আর এস এস-র নির্দেশে বি এম এস প্রত্যক্ষ লড়াই থেকে সরে গেলেও, কখনোই সাধারণ ধর্মঘটের বিরোধিতায় যায়নি। এমনকি বি এম এস পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের অনুগামীরা ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন।

অনেকে প্রশ্ন করেন এত লড়াই ধর্মঘট করে লাভ কী হলো? এর উত্তরে বলা যায়, লড়াইটা ছিল, উপর্যুপরি ধর্মঘট হয়েছে বলেই লাভ হয়েছে একাধিক—(ক) এখনও আমাদের দেশের অর্থনীতিতে আশির দশকের মেক্সিকো বা আর্জেন্টিনার মতো ধস্ নামে নি, (খ) ব্যাঙ্ক, বীমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ এবং ভারতীয় মুদ্রার পূর্ণ বিনিময় যোগ্যতা অনেকাংশে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলেই, ২০০৮-২০০৯ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার ধাক্কা অনেকটাই সামলানো সম্ভব হয়েছে। (গ) বিশ্বায়নের দর্শণের একেবারে বিপরীত পথে গিয়ে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে এম এন রেগার মতো সুবৃহৎ কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করতে শাসকশ্রেণীকে বাধ্য করা গেছে।

লড়াইয়ের এই ধারাবাহিকতাতেই আগামী ২৬ নভেম্বরের ধর্মঘট। তবে বর্তমান পরিস্থিতির অভ্যন্তরে 'নেতি'-র সমাহার অনেক বেশি। করোনা অতিমারির ধাক্কায় বিশ্ব অর্থনীতির চলমান মন্দা গভীরতর হয়েছে। আমাদের দেশেও এর প্রভাব তো পড়েছেই, পাশাপাশি অপরিকল্পিত লকডাউন সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। অতিমারিকালীন সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যখন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি পর্যন্ত অস্থায়ী রূপে হলেও, কিছু জনকল্যাণের কর্মসূচী গ্রহণ করছে, তখন আমাদের দেশের নরেন্দ্র মোদির সরকার এই সঙ্কটকালীন অবস্থাতেও দেশের স্বনির্ভরতার ভিত্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, প্রাকৃতিক, খনিজ ও রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদকে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজির কাছে ভেট দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে, এমনকি সংসদে বিপুল সংখ্যাধিকের জোরে স্বীকৃত সংসদীয় রীতিগুলিকেও উপেক্ষা করা শুরু হয়েছে।

তাই আগামী ২৬ নভেম্বর ধর্মঘট, শুধুমাত্র তিন দশকের ধারাবাহিক সংগ্রামের লিগ্যাসিই বহন করছে না, সমকালীন পরিস্থিতির নিরিখে এর সফল রূপায়ণের ওপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। তাই দেশপ্রেমের চেতনা নিয়েই এই লড়াই শামিল হওয়া প্রয়োজন। □

রক্তদান কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার উদ্যোগে গত ৬-১১-২০২০ কর্মচারী ভবন, বারাসাতে এক রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। এই মহতি সামাজিক কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, পশ্চিমবঙ্গ, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মানস গুমটা। তিনি তাঁর বক্তব্যে করোনা উত্তর পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য উত্থাপন করেন। এছাড়া এই সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদক পার্থ প্রতীম গোস্বামী এবং এই রক্তদান কর্মসূচীর আহ্বায়ক কৃতজিৎ চ্যাটার্জি। এই রক্তদান কর্মসূচীতে ৩ জন মহিলাসহ মোট ৮৬ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন। □

শ্রম আইন সংস্কার—কার স্বার্থে

মানস কুমার বড়ুয়া

প্রায় চার দশক ধরে দেশের শ্রম আইনের সংস্কার করার লক্ষ্যে একের পর এক সরকার চেষ্টা করছে। এই ধরনের প্রয়াস শুরু হয় ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় বারের জন্য ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতাসীন হয়ে আসার পর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে অবমাননাকর শর্তে টাকা ধার নেওয়ার পর থেকে। তারপর থেকেই শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে বলা শুরু হয়—শ্রম আইনগুলিকে নমনীয় করতে হবে। এই নমনীয়তার অভিমুখ হবে শ্রমিকদের বিপক্ষে এবং মালিকদের পক্ষে।

১ সেপ্টেম্বর ২০১১ একটি শ্রম বিরোধ সংক্রান্ত মামলার রায়দান প্রসঙ্গে মাননীয় বিচারপতি মার্কন্ডেয় কাটজু এবং চন্দ্রমৌলি কুমার প্রসাদ বলেন, “শ্রম আইনগুলি মেনে চলতে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে প্রায়শই মালিকরা বলে থাকেন—যে শ্রমিকদের বিষয়ে বলা হচ্ছে—বাস্তবে তারা তাদের শ্রমিক নন—ঠিকাদারের শ্রমিক।” এই এই প্রসঙ্গের বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বলেন, “শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে আলাদা আইনের প্রয়োজন হলো কেন?... শ্রমিকরা দরকষাকষির পাল্লায় মালিকদের সাথে সমান অবস্থানে থাকেন না—তাই শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন—যাতে তারা শোষিত না হন। আর এই আইনগুলো মান্য করার বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যেতে মালিকেরা অপকৌশল নিয়ে থাকে—এই আদালত সেই অন্যায় সুযোগ নেওয়া বরদাস্ত করবে না। এই অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিতে বিশ্বায়ন / উদারীকরণ / সমৃদ্ধির কথা বলে শ্রমিকদের অমানবিক শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে দেওয়া যায় না।” ২০১১ সালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ একটা বিষয় নিশ্চিত করে যে ভারতে চালু থাকা শ্রম আইনগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে ইতিবাচক ধারাগুলিকেও মালিকশ্রেণী অমান্য করে। চালু আইনগুলি ১০০ শতাংশ শ্রমিক স্বার্থে প্রণীত হয়েছিল এ দাবি কেউ করবে না। তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের আইনি রক্ষাকবচ যেটুকু তাতে ছিল তাও মালিকশ্রেণী মান্য করত না। কেন্দ্রের সরকার যদি পুরোপুরি মালিকশ্রেণীর স্বার্থের হয়ে কাজ করে, তাহলে শ্রম আইনের সংস্কার পুরোপুরি মালিকদের স্বার্থে করবে। সেই কাজটাই করেছে মালিকশ্রেণীর পক্ষে পুরোপুরি ঝুঁকে থাকা কেন্দ্রের মোদী সরকার। দেশে চালু থাকা ৪৪টি শ্রম আইনের বিকল্প হিসেবে ৪টি শ্রম কোড প্রণয়ন করে শ্রমজীবীদের এযাবৎকালে অর্জিত প্রায় সব অধিকার কার্যত কেড়ে নিয়েছে।

আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত শিল্প শ্রমিকদের নিয়ে তিনটি আইন ছিল। সেগুলো হলো—১। দ্য ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট, ১৯২৬, ২। দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট (স্ট্যান্ডিং অর্ডার) অ্যাক্ট, ১৯৪৬, ৩। দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট, ১৯৪৬।

গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এই তিনটি আইন পাল্টে তার পরিবর্তে শ্রম আইন সংক্রান্ত তিনটি কোড তৈরি করল নরেন্দ্র মোদির সরকার। বর্তমানে তিনটি শ্রম কোড হলো—১। দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোড, ২০২০, ২। দ্য অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড-২০২০, ৩। দ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি কোড-২০২০।

২৬ সেপ্টেম্বর বিরোধীশূন্য লোকসভা ও রাজ্যসভায় প্রায় বিনা আলোচনায় এই তিনটি আইন পাশ করালো বিজেপি সরকার। এর আগে ৮ আগস্ট ২০১৯-এ মজুরি সংক্রান্ত অতীতের ৪টি আইনকে একত্রিত করে মজুরি সংক্রান্ত কোড পাশ করিয়েছিল বিজেপি সরকার। আমাদের দেশে পূর্বে মজুরি সংক্রান্ত চারটি আইন ছিল। সেগুলি হলো—১। দ্য পেমেন্ট অন ওয়েজেস অ্যাক্ট, ১৯৩৬, ২। দ্য মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট, ১৯৪৮। ৩। দ্য পেমেন্ট অফ বোনাস অ্যাক্ট, ১৯৬৫। ৪। দ্য ইকুয়াল রেমিউনারেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৬। এই চারটি আইনকে বাতিল করে আনা হলো কোড অন ওয়েজেস-২০১৯। এই আইন অনুযায়ী এখন দেশের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি, পেনশন, সাধারণ মজুরি ইত্যাদি নির্ধারিত হচ্ছে। আমাদের দেশে ৪৬ কোটি শ্রমজীবী মানুষ আছেন। যার ৪৯ শতাংশই মজুরির ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন হলো এত তাড়াহুড়ো করে এই পরিবর্তন কেন? দেশের প্রায় সব জাতীয় স্তরের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কেন বিনা আলোচনায় এই আইন তৈরি করা হলো? এটা ঠিক যে দীর্ঘদিন আগে তৈরি এই আইনগুলি সময়োপযোগী করা দরকার। বর্তমান সময়কে ধরে শ্রমিক স্বার্থে পরিস্থিতির উপযোগী পরিবর্তন, পরিমার্জন প্রয়োজন ছিল। এইজন্যই ২০০২ সালের জুন মাসে দ্বিতীয় জাতীয় লেবার কমিশনের সুপারিশ ছিল শ্রমিকদের স্বার্থ আরও সুরক্ষিত করার জন্য ছড়িয়ে, ছিটিয়ে থাকা মজুরী, শ্রমবিরোধ, শিল্পবিরোধ বিষয়ক আইনগুলিকে এক জায়গায় সুসংবদ্ধভাবে যুগোপযোগী করে তোলা দরকার।

প্রশ্ন হলো, এই উদ্দেশ্যেই কি চারটি নতুন শ্রম কোড তৈরি করা হলো? উত্তর হলো না। মোদি সরকারের শ্রম আইন সংশোধন করার মূল উদ্দেশ্য হলো লগ্নীপুঁজির মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিকদের মজুরি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেওয়া। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে অথচ মজুরি বাড়বে না, উল্টে প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পাবে এই নতুন শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড বা আইনে।

কোড অন ওয়েজেস—২০১৯

এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার একটি সাধারণ গড় মজুরি সমগ্র দেশের জন্য নির্ধারণ করবে এবং বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকটি অর্থনৈতিক মাপকাঠির উপর এই মজুরির পরিমাণ কিছুটা হেরফের হতে পারে। কিভাবে এই সাধারণ মজুরি নির্ধারিত হবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা ভিত্তি এই আইনে বলা নেই। যেমন এই নতুন ওয়েজ কোড অনুযায়ী দেশের দৈনিক গড় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছে মাত্র ১৭৮ টাকা। পূর্বের চাইতে কেবল ২ টাকা বেশি। কিসের ভিত্তিতে বা কোন নিয়মে এই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হলো তার কোনো ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক দেয়নি। একইভাবে রাজ্য সরকারগুলিও কোনো ভিত্তি ছাড়াই কার্যত একতরফাভাবে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে পারবে।

এই সংক্রান্ত পূর্বেকার ১৯৪৮ সালের আইনে (দ্য মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট, ১৯৪৮) বলা হয়েছিল ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মাপকাঠি কেবলমাত্র বেঁচে থাকার মতো মজুরি নয়, বরং একজন শ্রমিক যাতে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে, তার ভিত্তিতেই ন্যূনতম মজুরি ঠিক করতে হবে। এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও যাতে তিনি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পেতে পারেন সেটাও নিশ্চিত করতে হবে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে। ১৯৫৭ সালের ১৫তম শ্রম সম্মেলনে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে চারটি বিষয়কে বিবেচনায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল—(১) খাদ্য, (২) বস্ত্র, (৩) বাসস্থান, (৪) অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় খরচ বাবদ তিনজনের পরিবার চালাতে যা খরচ হয় সেটা। ১৯৮২ সালে সুপ্রিম কোর্ট একটি রায়ে নির্দেশ দেয় যে শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং উৎসবকালীন বিনোদনের খরচও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গণ্য করতে হবে। ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্ট একটি মামলায় স্পষ্ট নির্দেশ দেয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে—(১) সমগ্র পরিবারের পুষ্টি, (২) বস্ত্র, (৩) জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ, (৪) শিক্ষা, (৫) চিকিৎসা, (৬) বৃদ্ধ বয়সে জীবনযাপনের খরচ—এই ছয়টি বিষয়কে গণনার মধ্যে অবশ্যই রাখতে হবে। একজন শ্রমিকের দক্ষতা বা অদক্ষতার উপর ন্যূনতম মজুরি নির্ভর করবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি করা বিশেষজ্ঞ কমিটি সুপারিশ করেছিল গড় জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩৭৫ টাকা প্রতিদিন নির্ধারণ করার জন্য। নতুন মজুরি সংক্রান্ত কোড ২০১৯-এ এইসব বিষয়কে পাত্তাই দেওয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে প্রশাসক বা আমলারা তাদের ইচ্ছে মতো ন্যূনতম মজুরি ঠিক করবে। শিল্পপতিদের খুশি করার জন্য মোদি সরকার ন্যূনতম মানবিক বা আইনগত ভিত্তিকে অস্বীকার করে মাত্র ১৭৮ টাকা প্রতিদিন মজুরি ঘোষণা করেছে।

নতুন এই মজুরি কোড দেশে অবাধ শ্রমিক শোষণের রাস্তাকে পরিষ্কার করেছে। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে জাতিয় ন্যূনতম গড় মজুরির কমে মজুরি নির্ধারণের অধিকার দিয়েছে। এর ফলে শিল্পপতিদের আকৃষ্ট করার জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে শ্রমিকদের মজুরি কমানোর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এর প্রভাবে ইতিমধ্যে দিল্লীর ওখলা থেকে হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে শিল্প তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে। কারণ দিল্লীর তুলনায় হরিয়ানা বা উত্তরপ্রদেশে মজুরি কম, তাই শিল্পপতিরা সেখানে চলে গেছে।

আগের আইনে শিল্পভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হতো। নতুন আইনে ‘সময়ভিত্তিক’ এবং উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল হবে ন্যূনতম মজুরি। একই ধরনের শিল্পের আলাদা আলাদা কারখানায় ইচ্ছেমতো ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করার আইনি অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই আইনে শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেসব কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন দুর্বল অথবা ট্রেড ইউনিয়ন নেই সেখানে দক্ষ, অর্ধ দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ইচ্ছামতো নির্ধারিত হবে।

নতুন আইনে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শকের অধিকার ছেঁটে তাকে কার্যত ন্যূনতম মজুরি উপদেষ্টা (facilitator) বানানো হয়েছে। অতীতের আইনে কোনো শিল্প মালিক ন্যূনতম মজুরি আইন লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ ছিল। নতুন কোডে এটিকে দেওয়ানি আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা শিল্প মালিকদের অপরাধকে লঘু করে দেওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা হলো। নতুন কোডে শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে আদালতে যাওয়ার রাস্তাও কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা কেবলমাত্র তাদের অভিযোগ নিয়ে আমলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি আধা-বিচার ব্যবস্থা (Quasi-Judicial) কাছে আবেদন করতে পারবে।

নতুন মজুরি কোড প্রযোজ্য হবে যেখানে ২০-র বেশি শ্রমিক আছে। এর ফলে ইনফর্মাল সেক্টরে যুক্ত শ্রমিক, নিজেদের বাড়িতে বসে বিভিন্ন শিল্পের কাজ করা শ্রমিক—এরা এই আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে। বর্তমানে এই ধরনের শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। এরা কেউ মজুরি বিষয়ে কোনো আইনগত নিরাপত্তা পাবে না। জুতো তৈরি তেকে আই. টি শিল্প সব জায়গায় শ্রমিকের মজুরি নিরাপত্তা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হবে নতুন এই মজুরি সংক্রান্ত কোড-এ।

দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোড-২০২০ (IR Code-2020)

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে অতীতের তিনটি আইনকে এক জায়গায় এনে এই আই. আর কোড-২০২০ তৈরি হয়েছে।

যে সমস্ত শ্রমিক মাসিক ১৮ হাজার টাকার উপর বেতন পান, তাদের এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই আইনে সময়ভিত্তিক (Fixed term) শ্রমিক নিয়োগকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যে কোনো শিল্প কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী শ্রমিকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সময়ভিত্তিক নিযুক্ত শ্রমিক আর মালিক পক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস দেখাবে না, যদি তার চাকরি পুনর্নবীকরণ না হয় এই ভয়ে। যদিও এই আইনে বলা আছে স্থায়ী শ্রমিকদের মতোই আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা থাকবে এই সময়ভিত্তিক শ্রমিকদের। কিন্তু বাস্তবে তা কোনোদিনই হবে না। এই আইনের ফলে দেশ থেকে স্থায়ী শ্রমিক ব্যবস্থা কার্যত উঠে যাবে। মালিকপক্ষের হাতে ইচ্ছেমতো মজুরি কমানো এবং ইচ্ছেমতো শ্রমিক নিয়োগের অধিকার তুলে দেওয়া হলো এই আইনের মাধ্যমে।

এই নতুন কোডের চতুর্থ ও দশম অধ্যায়ে বলা আছে ৩০০-র কম সংখ্যক শ্রমিক আছে এমন সংস্থায় মালিকরা ইচ্ছেমতো লে-অফ ছাঁটাই এবং সংস্থা বন্ধ করে দিতে পারবে। অতীতে এই সংখ্যা ১০০-তে সীমাবদ্ধ ছিল এবং লে-অফ, ছাঁটাই ও সংস্থা বন্ধ করতে গেলে সরকারের আগাম অনুমতি নিতে হতো। বর্তমান আইনে মালিক পক্ষকে আগাম অনুমতি নেওয়ার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত দেশের ৭০ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের সংখ্যা ৩০০-র কম এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানেই দেশের ৭৪ শতাংশ শ্রমিক কাজ করে। দেশের ৭৪ শতাংশ শ্রমিককে মালিকপক্ষের হায়ার অ্যান্ড ফায়ার-এর ভয়ানক আক্রমণের মুখে ফেলে দিল বিজেপি সরকার।

এই নতুন কোডের ৬২ নং এবং ৮৬ নং অধ্যায়ের বিভিন্ন ধারায় শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার, ধর্মঘটের অধিকারকে কার্যত নস্যাৎ করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত জনস্বার্থে ব্যবহৃত জরুরি শিল্পে প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিক ছাড়া সব শ্রমিকদের এই অধিকার ছিল। নতুন আইনে বলা হয়েছে কোথাও ধর্মঘট করতে গেলে ১৪ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। এই নোটিশ বলবৎ বা কার্যকর থাকবে নোটিশ দেওয়ার দিন থেকে সর্বোচ্চ ৬০ দিন পর্যন্ত। নোটিশ দেওয়ার পর চালু হওয়া বা আগে থেকে চালু থাকা শ্রমিক পক্ষ ও মালিক পক্ষের আলোচনা চলাকালীন কোনো ধর্মঘট করা যাবে না। আলোচনা শেষ হওয়ার ৭ দিনের মধ্যেও কোনো ধর্মঘট করা যাবে না। আলোচনার পর কোনো পক্ষ যদি শিল্প বিরোধ ট্রাইব্যুনালে মামলা করে তাহলে যতদিন না নিষ্পত্তি হচ্ছে কোনো ধর্মঘট করা যাবে না। মামলার নিষ্পত্তির ৬০ দিনের মধ্যেও কোনো ধর্মঘট করা যাবে না। অর্থাৎ এই আইনের দ্বারা ধর্মঘটের অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়া হলো। কারণ ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ার পর মালিক পক্ষ লোক দেখানো শ্রমিকদের সাথে আলোচনা, ট্রাইব্যুনালে যাওয়া ইত্যাদির বাহানা করে ৬০ দিন অতিবাহিত করতে পারলেই ধর্মঘট কার্যকরী হবে না। যদি শ্রমিক এই আইন ভাঙে, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ আর্থিক জরিমানা এবং কারাবাসের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অপরদিকে মালিকপক্ষ লকআউট ঘোষণার ক্ষেত্রে অনেকরকম ছাড় পাবে এই আইনে। শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে মালিকপক্ষ বিনা নোটিশে লকআউট ঘোষণা করতে পারবে। কারোর অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এক কথায় মালিকদের যা খুশি তাই করার অধিকার দেওয়া হয়েছে এই আইনে।

নতুন কোডের চতুর্দশ অধ্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করার আইনী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে যদি একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকে তাহলে যে ইউনিয়নের প্রতি ৫১ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন আছে কেবল তাদের সাথেই আলোচনা করবে মালিকপক্ষ। কোনো ইউনিয়নের ৫১ শতাংশ সমর্থন আছে কিনা তা যাঁচাই করবার জন্য গোপন ব্যালটে ভোট গ্রহণের আইনকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। বলা হয়েছে কোন পদ্ধতিতে এটা নির্ধারিত হবে সে বিষয়ে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। আরও বলা হয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়নে কর্মকর্তাদের ৫০ শতাংশ কর্মরত শ্রমিক রাখা বাধ্যতামূলক হলেও, সংগঠিত ক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের ১/৩ ভাগ বা সংখ্যায় ৫, যেটা সর্বনিম্ন হবে, এর বেশি সংস্থার বাইরের লোক থাকতে পারবে না। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই নতুন কোড (I R Code-2020) সংসদীয় ব্যবস্থা, অর্থাৎ, লোকসভা, রাজ্যসভা বা রাজ্য বিধানসভাকে এড়িয়ে যে কোনো সময় সরকার তার ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করতে পারবে। অর্থাৎ সরকারী আমলারাই এই আইন পরিবর্তনে মুখ্যভূমিকা নেবে।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী ২০তম সাধারণ ধর্মঘট

বিরুদ্ধতার চাবুক ওঠাও হাতে

পূর্বের ১৯টি ধর্মঘট

(১) ২৯ নভেম্বর ১৯৯১, (২) ১৬ জুন, ১৯৯২, (৩) ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, (৪) ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, (৫) ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৮, (৬) ১১ মে ২০০০, (৭) ১৬ এপ্রিল ২০০২, (৮) ২১ মে ২০০৩, (৯) ২৪ জুন ২০০৪,)১০) ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫, (১১) ১৪ ডিসেম্বর ২০০৬, (১২) ২০ আগস্ট ২০০৮, (১৩) ৭ সেপ্টেম্বর ২০১০, (১৪) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ (১৫) ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, (১৬) ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ (১৭) ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬, (১৮) ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯, (১৯) ৮ জানুয়ারি ২০২০।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

আগামী ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছে। গত ২ অক্টোবর অন লাইনে অনুষ্ঠিত এক জাতীয় কনভেনশনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একইসাথে সাধারণ ধর্মঘটের সাত দফা দাবি সনদ (পত্রিকার পূর্বের সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং সাধারণ ধর্মঘটের প্রাক প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী যেমন ব্লকস্তর পর্যন্ত কনভেনশন, অফিস ও কারখানা গেটে প্রচার সভা, মিছিল, ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান উপলক্ষে জমায়েত, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ধর্মঘটের দাবি সনদের ব্যাখ্যা ও এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রকাশ প্রভৃতি কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। একথা সর্বজনবিদিত যে, ১৯৯১ সালে জাতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে নব্য উদারনীতির প্রয়োগ শুরু হয়। পরবর্তীকালে কেন্দ্রে যেক'টি সরকার গঠিত হয়েছে, প্রত্যেকেই অনুসরণ করেছে একই নীতি। তবে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী আর এস এসের মদতপুষ্ট বিজেপি সরকার গঠিত হলে, এই নীতি প্রয়োগ আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। দারিদ্র, বেকারি, কর্মহীনতা, ক্ষুধা, শিশু মৃত্যু, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি পুঁজিবাদী ব্যাধি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। কিন্তু ইতিবাচক দিক হলো এই যে, ভারতীয় জনগণ, বিশেষত শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব নীতি মাথা পেতে মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে ওঠে এবং ১৯৯১ সালে ২৯ নভেম্বর এই পর্বের প্রথম দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে আরও ১৮টি ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। সর্বশেষ ধর্মঘটটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০২০ সালের ৮ জানুয়ারি। এই ধর্মঘটে সারা দেশের প্রায় ২৫ কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অন্যান্য ধর্মঘটগুলির ন্যায় এবারের ধর্মঘটেও আর এস এস পরিচালিত ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বি এম এস) এবং এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত আই এন টি টি ইউ সি জাতীয় কনভেনশনে যোগ দেয়নি। অর্থাৎ এই রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় শাসকদল ও রাজ্যের শাসকদলের বিরোধিতাকে মোকাবিলা করেই ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে।

এক

এবারের ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তা পূর্বের ধর্মঘটগুলির তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। ২০১৯ সালের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত বি জে পি জোট সরকার পূর্বের তুলনায় আরও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়। ফলে পূর্বের সরকারের কিছু অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। বিশেষত সি এ এ, এন আর সি এবং এন পি আর সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এবং রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের ন্যায় সমমনোভাবাপন্ন দলগুলির 'কৌশলী' অবস্থানকে ব্যবহার করে অনুমোদন করিয়ে নেয়। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিশেষত আসাম সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দান, দিল্লীর শাহিনবাগ সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। এই আন্দোলন ভাঙতে দিল্লীতে আর এস এস-বিজেপির মদতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করা হয়। অর্ধ শতাধিক মানুষ নিহত এবং পাঁচ শতাধিক মানুষ আহত হয়।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের 'সাফল্য'কে পুঁজি করে সংবিধানের ৩৭০ নং ও ৩৫(ক) ধারা বাতিল করে কাশ্মীরের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রত্যাহার করা সহ জম্মু-কাশ্মীরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ধর্মীয় বিভাজনের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে পরিবর্তন সাধন করা হয়। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধেই শুধু অবস্থান গ্রহণ করা হয়নি, জনসমাজ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি দমনপীড়ণ, প্রশাসনিক সন্ত্রাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গণআন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা হয়েছে। মানুষ কিন্তু মুখ বুঁজে সব সহ্য করেনি। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই এর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদকে ধ্বনিত করেছে। এই সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ফলাফলগুলি তার প্রমাণ। মহারাষ্ট্র আগেই তাদের হাত ছাড়া হয়েছিল। তারপর ঝাড়খণ্ড হাতছাড়া হয়। বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয় ঘটে।

এইরকম পরিস্থিতিতে ১২ দফা দাবিতে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী, শিক্ষকদের অর্ধশতাধিক সর্বভারতীয় ফেডারেশনের আহ্বানে চলতি বছরের শুরুতে ৮ জানুয়ারি উনিশতম সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ঐ ধর্মঘটে ২৫ কোটি শ্রমিক কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। বি এম এস বা এই রাজ্যে আই এন টি টি ইউ সি নেতৃত্ব ধর্মঘটের বিরোধিতা করলেও তা উপেক্ষা করে তাদের অনুগামীরা বিপুল সংখ্যায় ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বলাই বাহুল্য কেন্দ্রীয় সরকার এই ধর্মঘট থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে, একই নীতি আরও আগ্রাসী ভঙ্গীতে চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের আন্দোলনকে তীব্রতর করতে থাকে। কয়লা শিল্প, প্রতিরক্ষা শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে একাধিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক মন্দা জাতীয় অর্থনীতিকে ক্রমশই গ্রাস করতে থাকে। এসবের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেশের শিল্পপতি গোষ্ঠীকে ব্যাপক সুবিধা প্রদান করা হয়। শিল্পপতিদের প্রদেয় কোম্পানী করের পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২২ শতাংশ করা হয়। দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসীন হয়ে মোদী সরকার ঘোষণা করেছিল ১০০ দিনের মধ্যে ৪২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বিক্রি করে দেওয়া হবে। এশিয়ার বৃহত্তম রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস সহ রেলের বিভিন্ন কারখানা বেসরকারীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেসরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণে তুলে দেওয়া হচ্ছে যাত্রীবাহী ১৫৩টি ট্রেন, ৫০টি রেল স্টেশন। এর ফলে বিপুল সংখ্যক রেল কর্মচারী কর্মচ্যুতির বিপদের সম্মুখীন। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে দুর্বল করার লক্ষ্যে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ ঘটছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থা এল আই সি-র শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। দেশের ছ'টি বিমান বন্দরের পরিচালনা এবং উন্নয়নের দায়িত্ব গৌতম আদানী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এগুলি হলো অমৃতসর, বারাণসী, ভুবনেশ্বর, ইন্দোর, রায়পুর এবং ত্রিচি। এর আগে তাদের নিয়ন্ত্রণে গেছে জয়পুর, গৌহাটি এবং তিরুবনন্তপুরম বিমান বন্দর।

এইরকম পরিস্থিতির বিরুদ্ধে যখন দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে উঠছে, তখনই কোভিড অতিমারি সারা দেশে আত্মপ্রকাশ করে। এবং দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এপর্যন্ত (৩১ অক্টোবর) সারা দেশে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৮১,০৮,৪০৮। মৃতের সংখ্যা ১,২২,২১১। আমাদের রাজ্যে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৭৭,৬৫১ ও ৬,৯০০। বিশ্বে অতিমারিতে প্রথম মৃত্যুর খবর আসে চীনের উহান অঞ্চল থেকে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই সংবাদের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই রোগ মোকাবিলায় নানান ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার ছিল নির্লিপ্ত। ৩০ জানুয়ারি কেরালায় প্রথম করোনা পজিটিভের খবর আসে। কেরালার এল ডি এফ সরকার উহান থেকে ফেরা বা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ছাত্র বা অন্যান্যদের উপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র নির্দেশ অনুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র ফেব্রুয়ারি মাস এবং মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। এই সময়ে প্রচুর জনসমাগম হতে পারে এমন কর্মসূচী আটকানোর পরিবর্তে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের 'নমস্তে ট্রাম্প' কর্মসূচী সফল করতে প্রধানমন্ত্রী দারুণ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি মোতেরা স্টেডিয়ামে লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার মতো অতিমারিতে আক্রান্ত দেশ থেকে লোকজনদের নিয়ে তবলিঘি মার্কাজ দিল্লীতে সংগঠিত করা হলো। এর উদ্যোক্তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকা যেমন সমালোচনার যোগ্য, তেমনই এই জমায়েতের অনমুতি দেওয়ায় জন্য সমালোচনার দায় অস্বীকার করতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকার। জাতীয় সংসদ ২৩ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন চলেছিল। আসলে এই গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বি জে পি মধ্যপ্রদেশের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারের বিধায়ক কেনা বেচার মধ্য দিয়ে পতন ঘটিয়ে নিজেদের সরকার গঠনের মহান কাজে (?) ব্যস্ত ছিল।

নরেন্দ্র মোদী সরকার শুধু যে করোনা মোকাবিলার প্রাথমিক পর্বে চূড়ান্ত অপদার্থতা দেখিয়েছে তাই নয়, লকডাউন ঘোষণার ক্ষেত্রেও এই ব্যর্থতা প্রকট হয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে লকডাউন ঘোষণার মধ্য দিয়ে কোনো সুরাহা ঘটেনি। কারণ লকডাউন কোনো নিরাময় নয়। লকডাউন কেবল সংক্রমণ প্রতিরোধের একটি ব্যবস্থা। লকডাউনের সময় ব্যাপক পরীক্ষা ও আক্রান্তদের চিহ্নিত করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, আক্রান্তদের সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের চিহ্নিত করে নিভৃতবাসে রাখার ব্যবস্থা প্রভৃতি করা প্রয়োজন যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ লকডাউনের সময় করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এসব পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে করোনাকে মহাভারতের যুদ্ধের সাথে তুলনা করে ২১ দিনের মধ্যে অতিমারির বিরুদ্ধে জয় আসবে বলে নিদান হেঁকে ছিলেন।

লকডাউনের সময় চিকিৎসা ও হাসপাতালে পরিকাঠামোর কোনো উন্নতি করা হয়নি। স্পেন বা আয়ারল্যান্ডের মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও যেখানে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে সমগ্র বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলো, এখানে কেরলের এল ডি এফ সরকার ব্যতীত নরেন্দ্র মোদী সরকার বা আর কোনো রাজ্য সরকারই কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

প্রাক অতিমারি পর্ব থেকেই ভারতীয় অর্থনীতি প্রয়োজনীয় চাহিদার অভাবে ব্যাপক মন্দার সম্মুখীন হয়। মোদী সরকারের বিমুদ্রাকরণ, অপরিকল্পিতভাবে জি এস টি ঘোষণা প্রভৃতি সিদ্ধান্ত এর অন্যতম কারণ। ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষের বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ৬.১ শতাংশ, ২০১৯-২০ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৪.২ শতাংশে নেমে আসে। বিগত ১১ বছরের মধ্যে জি ডি পি বৃদ্ধির এই হার সর্বনিম্ন। আর্থিক বৃদ্ধির হারের ক্রমবর্ধমান সঙ্কোচন চলতি আর্থিক বছরে অর্থনীতির সঙ্কোচনে পরিণত হয়েছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী চলতি আর্থিক বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক (অর্থাৎ মার্চ-মে) জি ডি পির ২৩.৯ শতাংশ সঙ্কোচন ঘটেছে। জি ডি পি বৃদ্ধির ক্রমহ্রাসমান হার ও শেষ পর্যন্ত তা সঙ্কোচনের পরিণতিতে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সি এম আই ই-র তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৫ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছে। এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে বেকারির হার ২৩.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭.১ শতাংশ। ২০১৯-২০ সালে গড় নিয়োগের সংখ্যা ৪০.২ কোটি থেকে লকডাউনের প্রথম মাস অর্থাৎ এপ্রিল মাসে প্রায় ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৬.২ কোটি হয়েছে। অর্থাৎ হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ২৪ কোটি। পরবর্তী মাস গুলিতে হ্রাসের পরিমাণ আরও বেশি।

এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে প্রধানত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, ছোটো ব্যবসায়ীরা। দেশের যুব সমাজ বেকারীর আঘাতে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ২০ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ২.৭ কোটির বেশি যুবক কাজ হারিয়েছে। ৩০-৩৯ বছর বয়সীদের মধ্যে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা ৩.৬ কোটি।

পরিকল্পনাহীন, আকস্মিক এবং অবৈজ্ঞানিক

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

২৬ নভেম্বর, ২০২০

সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট

দেশ রক্ষার সংগ্রামে শামিল আমরাও

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

অনিশ্চিত অবস্থায় দেশবাসী। লকডাউনে অনিশ্চয়তা বেড়েছে। মোদী সরকার কোভিড পরিস্থিতিতেও দেশের শ্রমিক-কৃষকদের যে বিপদে ফেলছেন তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এই সময়ে কর্মক্ষম মানুষের আয় যেমন কমেছে, তেমনি নিয়োগও কমেছে। বেড়েছে কর্মচ্যুতি। কাজের সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কর্মসঙ্কোচন। বহু ক্ষেত্রে বেতন কমছে। গত সাত মাসে ফসলের অভাবী বিক্রি আরও বেড়েছে।

আর এস এস নিয়ন্ত্রিত বি জে পি সরকারের মানুষকে বাঁচানোর কোনো দায় নেই। কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিকে মোদী সরকার উদারবাদ প্রয়োগের একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সে কাজ করে চলেছে। অতিমারি সঙ্কট মোকাবিলার নামে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ঘোষণার আড়ালে মানুষের প্রতিবাদকে গত সাত মাস ধরে স্তব্ধ করার অপচেষ্টা হয়েছে। গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির কাজের ক্ষেত্রে বাধা এসেছে। মোদী সরকারের নীতির ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রান্তিক অবস্থানের দিকে চলে যাচ্ছেন। কোভিড-১৯-এর আগেও দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো ছিল না। জি ডি পি বৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছিল। কোভিড-১৯-কে এখন ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে শাসকে শ্রেণী। লকডাউনের আগেই কৃষির সাথে যুক্ত মানুষের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছিল। কৃষকের আত্মহত্যা বাড়ছিল। ঋণগ্রস্ত কৃষি পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কৃষকের ফসলের মোট উৎপাদন ব্যয়ের ৫০ শতাংশ লাভ রেখে যে সহায়ক মূল্য নির্ধারণের কথা ছিল তা বাস্তবায়িত করার প্রতিশ্রুতি ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে বি জে পি দিয়েছিল। বি জে পি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। প্রধানমন্ত্রীর বহু বিজ্ঞাপিত ফসল বিমা যোজনায় চাষির লাভ হয়নি, লাভ হয়েছে বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলির।

লকডাউনের কারণে গণপরিবহন সহ স্বাভাবিক জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায়, কৃষি উৎপাদনেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। কৃষকের ওপর বাড়তি অর্থনৈতিক বোঝা চেপেছে। গণপরিবহনের অভাবে ফলে উৎপাদিত ফসল বিক্রির সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। চাষি তার উৎপাদিত পণ্য নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে।

লকডাউনজনিত পরিস্থিতিতে অন্নদাতারা চরম সঙ্কটে পড়লেও রাষ্ট্র কৃষকের জন্য কোনো সহায়তার ব্যবস্থা করেনি। কোনোরকম আর্থিক সহায়তাও দেয়নি। মোদী সরকার কর্পোরেটদের রক্ষা করতে শ্রমিক ও কৃষকদের উপর বোঝা চাপিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এই সময়ের মধ্যে মাত্র এক মাসে দেশের ৫০ জন পুঁজিপতির ৬৮ হাজার কোটি টাকার ঋণ আর বি আই মকুব করেছে। আসলে করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গ্রামীণ জনগণ ও শ্রমজীবী মানুষকে লুঠ করার অভিযানে নেমেছে বি জে পি সরকার।

করোনা নিয়ন্ত্রণে 'লকডাউন' ঘোষণা করা দরকার ছিল, এটা ঠিক। কিন্তু হঠাৎ করে মাত্র ৪ ঘণ্টার নোটিশে এত বড় দেশে লকডাউন চাপিয়ে দেওয়া কি আদৌ যুক্তিযুক্ত ছিল? কোটি কোটি 'দিন আনি দিন খাই' গরিব মানুষের রোজগার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে তারা কিভাবে বাঁচবে, কী খাবে এটা ভাবা কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব ছিল। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা না করে, সরকার যে উপেক্ষা ও গাছাড়া মনোভাব দেখালো তার মূল্য দিতে হলো বহু পরিযায়ী শ্রমিককে তাদের প্রাণের বিনিময়ে। লকডাউনের আগে তো এদের কথা ভাবা হলোই না, এমনকি লকডাউনের পরে যখন গরিব নিম্নবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্ত মানুষেরও দুর্দশা ক্রমশ বাড়ছে, দাবি উঠেছে যাদের প্রয়োজন সেই পরিবারগুলির কাছেই ৬ মাসের জন্য প্রতি মাসে বিনামূল্যে ১০ কেজি করে খাদ্য শস্য (চাল, গম ইত্যাদি) পৌঁছে দেওয়া হোক। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাড়তি কোনো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন নেই। যা খাদ্যশস্য প্রয়োজন তার থেকে বেশি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের গুদামে সাড়ে ১০ কোটি টন খাদ্যশস্য পচছে। কেন্দ্রীয় সরকার ৫ কেজি করে খাদ্যশস্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু যাঁদের দরকার তাঁদের মাত্র ১৩.৭ শতাংশের কাছে এই সহায়তা পৌঁছেছে। চাহিদার সঙ্কটের কারণে অর্থনীতি কার্যত স্থবির হয়ে গিয়েছে। রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়া পরিবারগুলিকে আগামী ৬ মাস মাসিক ৭৫০০ টাকা করে দেওয়ার প্রচার বামপন্থী রাজনৈতিক দল সহ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই পরামর্শ, যা মানুষকে বাঁচাতে পারে, তাতে কান দেয়নি। সরকার একদিকে তালি ও থালি বাজাতে, টর্চ জ্বালাতে বলেছে, মহাভারতের গল্প শুনিয়েছে, আর অন্যদিকে দেশী-বিদেশী শিল্পপতিদের দেদার ঋণ মকুবের ব্যবস্থা করেছে। মাঝারি শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালু করার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু যখন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা শূন্য, তখন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালু করে লাভ কী? আর লাভ না হলে শিল্পপতিরা নিজেদের জমা অর্থ বিনিয়োগ করে বা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালু কেনই বা করবে? ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে যতই 'আর্থিক প্যাকেজ' ঘোষণা করুক না কেন, তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। লকডাউনের সময় কোটি কোটি না খেতে পাওয়া মানুষের মুখে অন্ন জোটেনি। কাজ হারিয়ে দেশের বিপুল অংশের মানুষ এখন অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। বর্তমানে আনলক পর্বেও অর্থনীতির হাল ফেরেনি। মানুষের আয় না থাকায় বাজারে চাহিদাও তলানিতে নেমেছে। সর্বস্তরের সঙ্কট তীব্রতর হয়েছে। মানুষের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে আয়করদাতা নয়, এমন সমস্ত পরিবারকে মাসে নগদ ৭৫০০ টাকা করে দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ ক্ষেত্রে এন রেগার কাজ ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ২০০ দিন এবং শহরেও এই প্রকল্প চালু করার দাবি জোড়ালো হয়েছে। আওয়াজ উঠেছে অবিলম্বে কেন্দ্রের জনবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে। দাবি প্রদানে সম্মত না হলে তা ছিনিয়ে আনতে হবে। এটাই এই সময়ের চাহিদা। আর এই দাবিতেই আগামী ২৬ নভেম্বর দেশ স্তব্ধ হবে। দেশের শ্রমজীবী মানুষ গর্জে উঠবে স্বৈরচারি শাসকের বিরুদ্ধে।

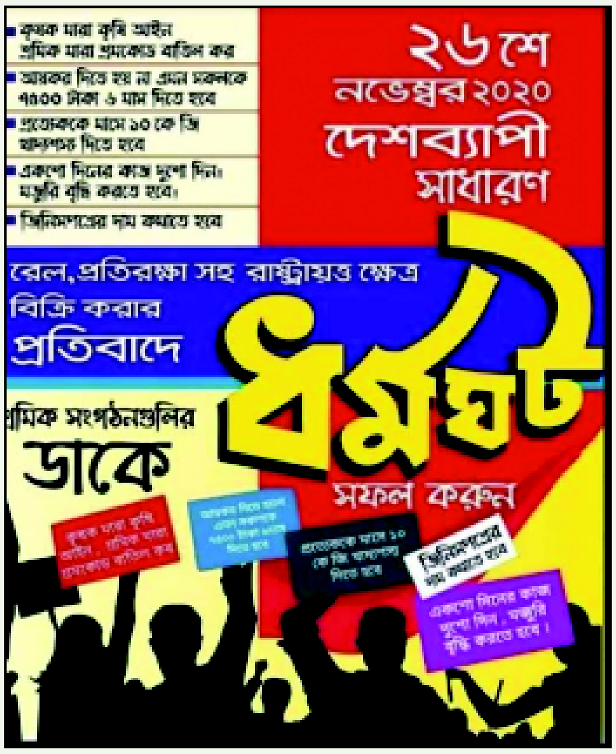

ফ্যাসিস্ত মতাদর্শে পরিচালিত আর এস এস'র অ্যাজেন্ডাকে কেন্দ্রের বি জে পি সরকার সরাসরি কার্যকর করতে নেমেছে। তা করতে গিয়ে দেশের সংবিধান এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের যে মৌলিক চারটি স্তম্ভ : ১। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, ২। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ৩। সামাজিক ন্যায় বিচার এবং ৪। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা— প্রত্যেকটির ওপরেই আক্রমণ নামিয়ে আনছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের নতুন চেহারা কেন্দ্রীয় সরকারকে এক দিশেহারা পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এই সঙ্কট সমাধানের জন্য কোনো জনহিতকর কার্যকরী পথের সন্ধান না করে, দেশী-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার অজুহাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা এবং যাবতীয় সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। সংসদের কাজকর্মকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। উপেক্ষা করা হচ্ছে বিচার ব্যবস্থাকেও। আদতে বি জে পি সরকার অতিমারি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের অবশিষ্ট অ্যাজেন্ডাগুলি দ্রুত কার্যকরী করে দেশের শাসন ব্যবস্থার কাঠামোটাকেই পরিবর্তন করতে চাইছে।

নব্য উদারবাদী বাজারকেন্দ্রিক পুঁজির চাহিদা অনুযায়ী আর এস এস তথা বিজেপি সমগ্র দেশকে এককেন্দ্রীক প্রশাসনের মধ্যে নিয়ে আসতে চায়। গোটা বাজারকে একই নিয়মে আবদ্ধ করে কেন্দ্রীভূত এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে লুণ্ঠন করা যায়। বাধাহীন করার জন্য শ্রম আইনের সংশোধন করা হচ্ছে। অথচ অক্সফ্যাম কর্তৃক প্রকাশিত কমিটমেন্ট টু রিডিউসিং ইনইকুয়ালিটি ইনডেক্স অনুসারে বিশ্বের ১৫৮টি দেশের মধ্যে শ্রমিক অধিকার রক্ষার নিরিখে ভারতের স্থান ১৫১ নম্বরে। শ্রম আইনের ৪৪টি বিধি কমিয়ে ৪টি কোড তৈরি করার উদ্দেশ্য মালিকপক্ষের স্বার্থ সিদ্ধি করা। মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ধ্বংস করাই যখন শাসকশ্রেণির লক্ষ্য, তখন সাধারণ মানুষ কি বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করবে, না প্রতিবাদের পথ খুঁজে নেবে? কাজেই এই প্রতিআক্রমণ দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচানোর লড়াই, যা সংবিধান সম্মত। তাই আগামী ২৬ নভেম্বর দেশ বাঁচানোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে দেশের মেহনতী জনগণ।

কেন্দ্রে শাসকদল শ্রমিক, কৃষক স্বার্থবিরোধী হওয়ায় মানুষের ক্ষোভ ক্রমবর্ধমান। এন পি আর-এন আর সি থেকে দিল্লি গণহত্যা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দিতে কাফিল খান, সাফুরা জারগার, ভারভারা রাও, উমর খালিদ প্রমুখের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস—এইসব থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতেই নানান অবৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে অবতারণা করে চলেছে। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজনের ঘৃণ্য খেলায় মেতেছে। একইভাবে এই রাজ্যে ইমাম, পুরোহিত ভাতা বা সাংবাদিকদের 'বকশিস' দিয়ে ধর্মীয় ভাবাবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাতে সারদা বা অন্যান্য দুর্নীতি নিয়ে মানুষ বিব্রত করতে না পারে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় শাসকদলের মূল অভিসন্ধি মানুষের প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া।

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের ফ্যাসিস্ত সুলভ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিবাদে সারা দেশের সাধারণ গণতন্ত্রপ্রিয় খেটে খাওয়া মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। সারা দেশের ন্যায় এই রাজ্যের মানুষ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় শক্তির বিরুদ্ধে আগামী ২৬ নভেম্বর ধর্মঘটে অবতীর্ণ হচ্ছেন। রাজ্যের শ্রমজীবী জনগণের অংশ হিসেবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার স্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত, কেন্দ্রীয় সরকার যেমন কেউ প্রতিবাদ করলেই দেশদ্রোহীর তকমা লাগিয়ে জেলে পুরছে। রাজ্যেও প্রশাসনের অভ্যন্তরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে বা ন্যায্য দাবি উত্থাপন করলে নেতা-কর্মীদের দূর-দূরান্তে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা কি তাহলে কেন্দ্রের নীতির আক্রমণ এবং রাজ্যের নীতি যা আমাদের অধিকার ও মর্যাদায় আঘাত করছে, এই দুয়ের বিরুদ্ধে একযোগে ধর্মঘট করতে পারি না? কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের মেকি যুদ্ধ যুদ্ধ নাটক চললেও কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘট ভাঙতে রাজ্য সরকার ফতোয়া জারি করবে। মহার্ঘভাতা না দিয়ে প্রতি মাসে কয়েক হাজার কোটি টাকা লোপাট করে দেওয়া রাজ্য সরকার বেতন কাটার ভয়ও দেখাবে। বদলির প্রচ্ছন্ন হুমকিও চলবে। এসবই আমাদের জানা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচাতে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহ ২ অক্টোবর জাতীয় কনভেনশন থেকে ৭ দফা দাবিতে যে সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সেই দাবিগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং তার সাথে আমাদের নিজস্ব ২ দফা দাবিকে যুক্ত করে, মোট ৯ দফা দাবিতে আমরাও প্রশাসনের হুমকিকে উপেক্ষা করে আসুন পূর্ণ শক্তি নিয়ে সামিল হই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমগ্র অংশের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক আক্রমণ এবং তীব্র আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ২ দফা সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে আগামী ২৬ নভেম্বর ধর্মঘটে সামিল হব। সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ৭ দফা দাবিকে সমর্থন করে এবং আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে গৃহীত ২ দফা দাবিকে সামনে রেখে সর্বত্র ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলছে।

শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজের কাছে বিশেষ করে চুক্তিপ্রথা / অস্থায়ী চুক্তিপ্রথার শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের কাছে আহ্বান, সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে, ভয়-ভীতি আক্রমণকে উপেক্ষা করে জীবন-জীবিকার স্বার্থে ধর্মঘটের প্রস্তুতির কাজে এগিয়ে আসুন। মিছিল, মিটিং, পথসভা অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে অংশ নিন। ৯ নভেম্বর স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান দিবস। ঐদিন টিফিনের সময় প্রতিটি দপ্তরে স্ট্রাইক নোটিশ পাঠ ও বিক্ষোভ সভা এবং কলকাতায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচী। দেশ বাঁচানোর লক্ষ্যে ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার মানসিক দৃঢ়তা গড়ে তুলুন। জয় আমাদের হবেই।

ধর্মঘটের দাবিসমূহ :

১। আয়করদাতা নয়, এমন সমস্ত পরিবারকে মাসে নগদে ৭৫০০ টাকা করে দিতে হবে।

২। প্রয়োজন আছে এমন সমস্ত পরিবারকে মাসে মাথা পিছু ১০ কেজি করে খাদ্যশস্য দিতে হবে।

৩। গ্রামীণ রেগা প্রকল্পে বছরে ২০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রকল্প শহরেও চালু করতে হবে।

৪। সমস্ত কৃষক বিরোধী আইন এবং শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড বিল প্রত্যাহার করতে হবে।

৫। আর্থিক ক্ষেত্র সহ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ বন্ধ এবং রেল, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র, বন্দর সহ সকল কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রের বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে।

৬। রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারী সংস্থায় চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক অবসর প্রকল্প বাতিল করতে হবে।

৭। সকলের জন্য পেনশন চালু করতে হবে। এন পি এস বাতিল করে পূর্বেকার পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ই পি এস-৯৫ কে আরও উন্নত করতে হবে

৮। প্রতিহিংসা পরায়ণ ও হয়রানিমূলক বদলি বন্ধ করতে হবে।

৯। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার অর্জিত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

বিরুদ্ধতার চাবুক ওঠাও হাতে

লকডাউন একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সঙ্কটকে আরও তীব্র করেছে, তেমনই অন্যদিকে তা বহু সংখ্যক মানুষের জীবিকার সর্বনাশ করেছে। বিশেষত এই কারণে পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর হিসাব অনুযায়ী এদের সংখ্যা ৮ কোটি বলা হলেও, এদের সঠিক সংখ্যা ১৪ কোটির কম নয়। লকডাউনের আকস্মিক ঘোষণায় এদের বড় অংশকে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঘরে ফিরতে হওয়ায় রাস্তায় খাবার মেলেনি, বাস চাপা পড়ে বা ট্রেন দুর্ঘটনায় এদের কেউ কেউ মারাও গেছে।

পরিস্থিতির এই ভয়াবহ অবস্থায় সাধারণ মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পেলেও এই পর্বে দেশের অতিধনীদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য অতি ধনীদের মধ্যে রয়েছেন মুকেশ আম্বানী, তিনি এ সময়ের মধ্যে এক হাজার কোটি ডলার নতুন পুঁজি হাসিল করে এশিয়ার সব থেকে ধনী ব্যক্তি হয়েছেন। তাঁর মোট সম্পত্তির মূল্য বর্তমানে ৫২৭০ কোটি ডলার। প্রাক অতিমারি পর্বের তুলনায় যা দু'হাজার কোটি ডলার বেশি। জনসংখ্যার এক শতাংশ ধনীদের আয়ত্তে রয়েছে, নীচের তলার ৭০ শতাংশ জনগণের মোট সম্পদের চার গুণ সম্পদ।

লকডাউন পরিস্থিতিতে যখন জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার তার জনবিরোধী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে চলেছে। দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বেসরকারীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। বি জে পি সরকার আর এস এস-এর অ্যাজেন্ডাকে কার্যকরী করতে এই সময়ের মধ্যেই অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। করেছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। দিল্লীর দাঙ্গায় প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল না করে সি পি আই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই নেতা ডি রাজা, জে এন ইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়তী ঘোষ প্রমুখের নাম অভিযোগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। কেন্দ্রীয় আর্থিক নীতির কারণেই দেশের অর্থনীতি মন্দায় আক্রান্ত হয়েছে। এর জন্য রাজস্ব সংগ্রহে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। জি এস টি আদায় কম হওয়ায় রাজ্যগুলির প্রাপ্য রাজস্বে ঘাটতি থেকে গেছে। জি এস টি আইন অনুযায়ী এই ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু তা প্রতিপালন করতে এখন কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করছে। বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক নীতি নয়, এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সম্পর্ক রয়েছে। এক কথায় বলা চলে যে, দেশের সংবিধানের প্রধান প্রধান স্তম্ভ যেমন অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, সংসদীয় গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার আজ আক্রান্ত। আগামী ২০তম সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের এটিই হলো পরিপ্রেক্ষিত। এই কারণেই সাধারণ ধর্মঘটের সাত দফা দাবির সাথে দেশের বর্তমান সঙ্কটের বিভিন্ন দিক যুক্ত। এইসব দাবির নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে দেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব।

দুই

এবারের ধর্মঘটের দাবি সনদের সাথে পূর্বের ধর্মঘটের দাবিগুলির আক্ষরিক মিল না থাকলেও অন্তর্বস্তুগত সাদৃশ্য প্রচুর। যেমন দাবি সনদের প্রথম দাবিটিই হলো আয়করের আওতাভুক্ত নয় এমন প্রতিটি পরিবারকে মাসিক ৭৫০০ টাকা প্রদানের প্রসঙ্গটি বর্তমান জাতীয় অর্থনীতির মন্দাক্রান্ত অবস্থা পরিবর্তনে সাহায্য করবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করা সম্ভব। ১৯-২০ কোটি পরিবারের হাতে প্রতি মাসে এই পরিমাণ অর্থ অনুদান দিলে তা চাহিদা সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের এক অংশের ধারণা যে এর ফলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হবে। উৎপাদনের তুলনায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি হবে। কিন্তু এই বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ চাহিদার অভাবে দেশের উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৩০ শতাংশ অব্যবহৃত রয়ে গেছে। সুতরাং বর্ধিত অর্থ সরবরাহকে মোকাবিলা করতে এই অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতাকে ব্যবহার করা যাবে। এর মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যারা কর্মরত আছেন, তাদের কর্মচ্যুতির আশঙ্কা দূর হবে। সব থেকে বড় বিষয় হলো অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই দাবিটি গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া দেশের ভাণ্ডারে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহের পণ্য সামগ্রী আমদানী করা যাবে। সর্বোপরি দেশের খাদ্য ভাণ্ডারে বর্তমানে ১০ কোটি টনের বেশি খাদ্যশস্য মজুত আছে। সুতরাং এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যাবে। দ্বিতীয় দাবিটি এই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

একশো দিনের কাজের প্রকল্পকে দুশো দিনে রূপান্তরিত করা এবং তা শহরাঞ্চলেও লাগু করার দাবিটির সাথে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত। বর্তমান বেকার সমস্যা সমাধানে কর্মসংস্থানকে নিশ্চিত করার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। সেদিক থেকে তৃতীয় দাবিটির গুরুত্ব অপরিসীম। কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউনের সুযোগ নিয়ে সংসদে বিরোধীদের অনুপস্থিতি ঘটিয়ে তিনটি কৃষি আইন অনুমোদন করিয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন তুলে দেওয়া, এ পি এম সি আইন তুলে দেওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশের খাদ্য সুরক্ষার উপর আঘাত সংগঠিত করা হয়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থা এর দ্বারা শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হবে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই কৃষিনীতির মধ্য দিয়ে ভারতের কৃষিপণ্যের বাজারকে বহুজাতিক কৃষি সংস্থাগুলি এবং দেশীয় কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির আশঙ্কাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিপজ্জনক দিক হলো 'চুক্তিচাষ' ব্যবস্থাকে চালু করা হবে। দেশের শ্রম আইনগুলিকে নিয়ে চারটি শ্রম কোড তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন করার অধিকার, দরকষাকষির অধিকার এবং ধর্মঘটের অধিকার কার্যত হরণ করা হয়েছে। প্রায় সর্বত্র চালু হতে চলেছে হায়ার এন্ড ফায়ার নীতি। সব থেকে বিপজ্জনক দিক হলো এই যে শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকারহীন করতে পারলে জনগণের অন্যান্য অংশকে অধিকারহীন করে ফেলা সম্ভব হবে। এই কারণে সমস্ত কালাকানুন বাতিলের দাবিটির সাথে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে রক্ষা করার দাবিটিও গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত।

দাবি সনদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবিটি হলো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও রেল, ব্যাঙ্ক, বীমাসহ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ বন্ধ করার দাবি। নরেন্দ্র মোদী সরকার দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতাশীন হওয়ার পর, এই বেসরকারীকরণ অভিযান আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি আর্থিক বর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে ২.১০ লক্ষ কোটি টাকা সংগৃহীত হবে। পি এম কেয়ার্স তহবিলে ৩৮টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ২১০ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। ভারতে বর্তমানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংখ্যা ৩৩৫টি। এর মধ্যে ১০টি মহারত্ন, ১৪টি নবরত্ন, ৭৩টি মিনি রত্ন-১ এবং ১২টি মিনি রত্নের মর্যাদা পেয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা আয় করেছিল। পূর্বের বছরে এই পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ২২ হাজার কোটি টাকা। বিভিন্ন কর, ডিভিডেন্ট, সুদ বাবদ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়ার পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা, পূর্বের বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৫২ হাজার কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির নীট প্রফিটের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭৪ হাজার কোটি টাকা। পূর্বের বছর এই পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫৫ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে দেশের বিপুল সম্পদ কার্যত জলের দরে বৃহৎ কর্পোরেট হাউসের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। একই সাথে এই অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করে যেহেতু রাজনৈতিক গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রির অর্থ দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দেওয়া।

ধর্মঘটের দাবিসনদে, সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীদের জবরদস্তিমূলক অবসরগ্রহণ করানোর যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে, তা বাতিলের দাবি করা হয়েছে। এই প্রশ্ন শ্রমিক কর্মচারীরা তুলছেন যে, ৭০ বছর বয়সের প্রধানমন্ত্রী যদি 'দক্ষতার' সাথে দেশ চালাতে পারেন, তাহলে ৫০ বছরের একজন শ্রমিক বা কর্মচারী কেন তাঁর দায়িত্ব প্রতিপালন করতে পারবে না? আসলে শ্রমিক কর্মচারীদের বর্ধিত উৎপাদনশীলতাকে ব্যবহার করে কম শ্রমিক কর্মচারী দিয়ে মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি করাই এর লক্ষ্য। ধর্মঘটের দাবি সনদে নয়া পেনশন প্রকল্প বাতিল করে পুরানো পেনশন ব্যবস্থা চালু এবং ১৯৯৫ সালে চালু ই পি এস কে উন্নত করার দাবি করা হয়েছে।

সাত দফা দাবিসনদ শুধু শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থেই নয়, দেশ ও জাতির স্বার্থে তা লেখা হয়েছে। তাই আসন্ন ধর্মঘটকে সফল করা এক দেশপ্রেমিক কর্তব্য। এর বিরোধিতা করার অর্থই হবে দেশবিরোধী কাজ।

তিন

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই এই ধর্মঘটকে ভাঙার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই রাজ্যে ধর্মঘটের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত অর্থনীতির প্রশ্নে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই। ফলে দেশ ও রাজ্য উভয় সরকারই জনবিরোধী নীতির প্রবক্তা। দ্বিতীয়ত বি জে পি-আর এস এস-র মোকাবিলার (?) নামে এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের সরকার এক ধরণের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতাবাদ যা কখনও কখনও সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদকে উৎসাহিত করে, তা কার্যকর করে চলেছে। তৃতীয়ত এ রাজ্যে সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, পঞ্চায়েত, বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারীদের দাবি দাওয়ার প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই গড়ে উঠেছে। এই ধর্মঘটে সকল রাজ্য কর্মচারীর অংশগ্রহণ আরও উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। এ এক মহান কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

শ্রম আইন সংস্কার—কার স্বার্থে

১৯৪৭ সালের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট আইনের পঞ্চম অনুচ্ছেদটি বর্তমান আইনে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বলা ছিল শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসা না হলে সরকারী কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালে পাঠাবে। এর ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আছে এমন সংস্থার শ্রমিকরাও সরকারী সহযোগিতা পেত। কিন্তু বর্তমান আইনে এটা বাতিল করে বলা হয়েছে শ্রমিক অথবা মালিকপক্ষকে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে হবে। এই কাজ একজন মালিকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও অধিকাংশ শ্রমিকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

দ্য অকুপেশনাল সেফটি, হেল্থ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড-২০২০

এই নতুন আইনের ২৭নং ধারায় অতিরিক্ত সময় কাজের (Overtime Work) উর্দ্ধসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সরকার এই সময়সীমা নির্ধারণ করবে। ৮ ঘণ্টা কাজের দুনিয়াজোড়া শ্রমিকদের অধিকার এর দ্বারা খর্ব করা হলো। কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা সে বিষয়ে নজরদারীর যে ব্যবস্থা ছিল তাকে কার্যত নির্বিষ করে দেওয়া হয়েছে।

কোভিড সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে অপরিকল্পিত লকডাউন ঘোষণার ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের যে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়বে, তাকে মাথায় রেখে পরিযায়ী শ্রমিকদের আরও সুরক্ষামূলক আইন প্রণয়নের বদলে ১৯৭৯ সালে তৈরি আন্তরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক সংক্রান্ত আইন (কর্মসংস্থান ও পরিষেবার শর্তাবলী) বাতিল করা হয়েছে। তার বদলে নতুন আইনে যুক্ত স্বল্প পরিসরে পরিযায়ী শ্রমিক সম্পর্কে দায়সাড়া কিছু কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৯ সালের আইনে বলা ছিল, কেবলমাত্র কন্ট্রাক্টর নয়, মূল নিয়োগকারী সংস্থাকেও সমস্ত আইন মেনে চলতে হবে। তাদের পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। সরকারকে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে হবে। এর মধ্য দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা অনেকটা নিরাপত্তা পেত। নতুন কোডে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে ১৯৭০ সালে তৈরি কন্ট্রাক্ট লেবার (রেগুলেশন এন্ড অ্যাবোলিশন) আইন অনুযায়ী স্থায়ী কাজ এবং সারা বছরে কাজ হয় এইরকম কাজে কন্ট্রাক্ট লেবার নিয়োগ করা যায় না। দুঃখের হলেও সত্য, বেসরকারী ক্ষেত্র তো বটেই সরকারী ক্ষেত্রেও বিশেষত নয়া উদারনীতি চালু হবার পর এই আইন কোথাও মানা হয় না। নতুন ক্ষেত্রে এই আইনটাই তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে যখন খুশি, যেখানে খুশি দীর্ঘস্থায়ী, বছরভর কাজেও কন্ট্রাক্ট লেবার নিয়োগ করতে পারবে মালিকপক্ষ। এদের দিয়ে স্থায়ী শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নিতে পারবে মালিকপক্ষ নামমাত্র মজুরি দিয়েই।

আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য ১৩টি আইন বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়েছিল। যেমন বাগিচা শ্রমিকদের জন্য আইন, ১৯৫১, খনি শ্রমিকদের আইন, ১৯৫২, বিড়ি-সিগারেট শ্রমিকদের পরিষেবা দান সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। নতুন ক্ষেত্রে এই সবক'টি আইনকে কার্যত বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে উপরোক্ত ১৩টি আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের সুরক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তা বাতিল করা হলো।

সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর দিক হলো, যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের বাইরে রাখতে পারে সরকার। অর্থাৎ সরকার চাইলে যে কোনো মালিকপক্ষকে কোনো আইন না মেনেই শিল্প প্রতিষ্ঠান চালানোর অনুমোদিন দিতে পারে। এই কোডে সরকারকে যখন খুশি ইচ্ছেমতো প্রশাসনিক নির্দেশে এই আইনের যেকোনো অংশ পরিবর্তন এবং বাতিল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমনকি সংসদের অনুমোদনেরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

দ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি কোড-২০২০

অতীতে বিভিন্ন আইনে শ্রমিক কর্মচারীদের সামাজিক নিরাপত্তার সংস্থান যেটুকু ছিল তা সব বাতিল করে বর্তমান কোডটি তৈরি করা হয়ছে।

পূর্বের আইনে শ্রমিকদের মজুরি এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধা না দিলে ফৌজদারি আইনে মালিক কর্তৃপক্ষের জেল হতো। বর্তমান আইনে শ্রম আইন ভঙ্গকারী মালিক কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিলেই মুক্তি পেয়ে যাবে। অর্থাৎ শ্রমিকের কোটি কোটি টাকা মেরে দিলেও মাত্র ৫০ হাজার টাকা দিলেই খালাস পেয়ে যাবে মালিক। এই হলো মোদী জমানায় শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার হাল।

মালিক কর্তৃপক্ষকে শ্রমিকদের কিছু অর্থ এবং সুবিধা বাধ্যতামূলক ভাবেই দিতে হয় (Statutory Dues) যেমন পি.এফ, গ্র্যাচুইটি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ইত্যাদি। একাধিকবার এই আইন ভঙ্গ করলে তাদের ৫ বছর জেলবন্দী হবার শাস্তিকে নতুন কোডে কমিয়ে ৩ বছর করা হয়েছে। এই আইন অতীতে থাকা সত্ত্বেও মালিকদের জেলে যাওয়ার ঘটনা বিরলতম ছিল। এই নতুন আইনের ফলে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে মালিকপক্ষ।

৯টি সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন বাতিল করে নতুন সোশ্যাল সিকিউরিটি কোড-২০২০ রচনা করা হয়েছে। ভারতে ৪৬ কোটি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে মাত্র ৯০.৭ শতাংশ কোনো সামাজিক সুরক্ষা পান না। জি-২০ দেশগুলির অন্যতম ঘোষণা অসংগঠিত শ্রমিকদের ১০০ শতাংশকেই সামাজিক সুরক্ষা বিধির আওতায় আনা হচ্ছে দেশের নতুন সামাজিক সুরক্ষা কোডে এর কোনো উল্লেখ নেই। ২০০৪ সালে নতুন পেনশন স্কীম ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল সব অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কীম চালু হবে। নতুন কোড-এ এরও কোনো উল্লেখ নেই।

শ্রম কোডগুলির ছত্রে ছত্রে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ভয়ঙ্কর সব প্রস্তাবনা লিপিবদ্ধ আছে। এই শ্রমিককোডে বিদেশী সরকারের শ্রেণীস্বার্থ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। মালিকদের মর্জি এবং আমলাদের কলমের খোঁচার উপর শ্রমিকদের ভবিষ্যৎকে নির্ভরশীল করে রাখার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে নয়া উদার আর্থিক নীতি চালু হবার পর থেকে শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী নানা পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা। ২০১৪ সালে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর চরম দক্ষিণপন্থী আক্রমণ শুরু হয় মূলত খেটে খাওয়া মানুষের উপর। তার জঘন্যতম নিদর্শন হলো শ্রম আইনগুলি পরিবর্তন করে অগণতান্ত্রিকভাবে চারটি শ্রম কোড তৈরি করার পদক্ষেপ। সঙ্গত কারণেই আগামী ২৬ নভেম্বর ২০২০ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা সাধারণ ধর্মঘটের অন্যতম দাবি হলো 'শ্রম কোড বিল বাতিল করতে হবে'। এই ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল করেই সরকারকে জবাব দিতে হবে। □

হাথরাস—রাষ্ট্রশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যবাদের মিলিত কু-কর্ম

সুতপা হাজরা

যাকে ছুঁলে জাত যাবে, তাকে অবলীলায় ছিঁড়ে ফেলা যায়। ধর্ষণ এবং অবর্ণনীয় আঘাত সত্ত্বেও চিকিৎসা মুলতুবি থাকে অথচ মৃত্যুর পর পরিবারকে গৃহবন্দী করে কালবিলম্ব না করে পুড়িয়ে ফেলা যায়। যায়, কারণ তিনি একজন দলিত নারী।

বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর হাথরাস জেলায় ১৯ বছর বয়সী মনীষা বাল্মীকি ভয়ঙ্কর রকমের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। দুষ্কৃতীরা ভেঙে দেয় তার গলার হাড় ও কেটে নেয় জিভ। আমরা দেখলাম ভাঙা হাড় ও ছেঁড়া জিভের অসহ যন্ত্রণা পেরিয়ে একটি মেয়ে বয়ান দিলেন—অভিযুক্ত সন্দীপ, রামু, লবকুশ ও রবি, যারা তথাকথিত উঁচু জাতের মানুষ। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। যতক্ষণ পর্যন্ত আঞ্চলিক মিডিয়া চেঁচেমেচি শুরু করেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ অভিযোগে ধর্ষণের ধারাও যুক্ত করেনি, মেয়েটির মৃত্যুর পরও পুলিশ বলেছে দর্ষণ হয়নি, শিরদাঁড়ায় আঘাত নেই, জিহ্বা অক্ষত ইত্যাদি।

সংবাদে প্রকাশ মেয়েটিকে প্রথমে হাথরাস জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সেখানে দু'ঘণ্টা বসিয়ে না দেখে রক্তবমি করা সত্ত্বেও গ্লুকোজ খাইয়ে ৩৫ কিমি দূরে আলিগড়ের জওহরলাল নেহরু মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে রেফার করে। ভরতীয় দণ্ডবিধির ১৬৬বি, ৩৭৫সি ধারা অনুযায়ী ধর্ষণকে একটি "মেডিকো-লিগ্যাল-ইমার্জেন্সি" ধরে নিয়ে অবিলম্বে সহায়তা প্রদান সরকারী বেসরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার কর্তব্য—এই কাজে দেরী হলে তা শাস্তিযোগ্য। কিন্তু এখানে তা লঙ্ঘিত হয়, অভিযোগে ধর্ষণের ধারা যোগ হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ও দু'দিন পর ২২ সেপ্টেম্বর প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের ২০১৪ সালের প্রোটোকল ও নির্দেশিকাবলে যৌন নিগ্রহের ৯৬ ঘণ্টা শারীরিক পরীক্ষা না হলে সেই সাক্ষ্য শরীর থেকে উধাও হয়ে যায়। ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রত্যাশিতভাবেই কিছু পাওয়া যায়নি বলে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক থেকে উত্তরপ্রদেশের শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা ঘটনাটিকে ফেক বলে প্রচার শুরু করেন। বলেন এর মধ্যে জাতপাত রাজনীতি আনা উচিত না—চলুন সবাই এর সুবিচার চাই। এই সুবিধাবাদী রাজনৈতিক অবস্থান, আমাদের সমাজের জাতপাত ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে তৈরি ক্ষমতার সোপানতন্ত্রকে অদৃশ্য করে রাখে। ভাবখানা এমন যে আমাদের সমাজে অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো জাতপাতের বৈষম্য নেই। এই অস্বীকার প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রশ্রয় দেয়।

উত্তরপ্রদেশের প্রশাসনের কাছেও হাথরাসের মেয়েটির দলিত পরিচয় প্রাধান্য পেয়েছে। তাই মিডিয়া সরব হওয়ার আগে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি এবং মেয়েটিকে আলিগড় হাসপাতাল থেকে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সফদর জং হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। যেখানে ২৯ সেপ্টেম্বর নির্যাতিতার মৃত্যু হয় এবং পরিবারকে গৃহবন্দী করে মধ্যরাতে তাকে দাহ করা হয়েছে। হাথরাসের শাসকদলের বিধায়ক অভিযুক্তদের স্বপক্ষে গ্রামে সালিসি সভার আয়োজন করে, যা কাঠুয়ায় আমিফার ধর্ষকদের সমর্থনে মিছিলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ন্যাশানাল ক্রাইম ব্যুরোর রেকর্ড অনুযায়ী দলিত নির্যাতনে সারা দেশের মধ্যে প্রথম উত্তরপ্রদেশ। সারা দেশের ২৫.৬ শতাংশ দলিত মানুষের উপর নির্যাতন উত্তরপ্রদেশে ঘটেছে এবং এদের মধ্যে বেশিরভাগই দলিত নারীর উপর যৌন নির্যাতন। যৌন হিংসা মূলতঃ ক্ষমতা প্রয়োগের এক বহু চর্চিত অস্ত্র। একজন অসম্মত মানুষকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলার মধ্যে যৌনতার চেয়েও অনেক বেশি থাকে আক্রোশ, থাকে অন্যকে নিশ্চিহ্ন করে নিজের অবস্থান অটুট রাখার দায়। যাকে দুর্বল ভেবে এতদিন উপেক্ষা করেছি সে কোন সাহসে কাঁধে কাঁধ মেলাবে? অতএব শিরদাঁড়া ভেঙে দাও। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ভিন্ন, যে নিম্ন, যে আর্থিকভাবে দুর্বল, যাকে দেখলে নিজের বৃত্তের বা গোষ্ঠীর মনে হয় না, তাকে অসম্মানের ও অত্যাচারের কেন্দ্রে বসিয়ে দেয়া সহজ। বৈষম্য ও বিদ্বেষের চরম মাত্রাগুলির মধ্যে থাকে ধর্ষণ—খুন। লজ্জাজনকভাবে আমরা দেখি সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধার দরুন যৌনহিংসা ঘটানোর পরেও অনেকে পার পেয়ে যান। মাঠে পড়ে থাকা শরীর হাসপাতালে পৌঁছালেই প্রশাসনিক দায় ফুরোয় না। তদন্ত যাতে মাঠে মারা না যায়, সেটা কায়েম করাও আবশ্যক।

হাথরাসের ঘটনার সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো রাষ্ট্রে সবক'টি স্তম্ভের হাতে হাত মিলিয়ে চলা। অনেক সময় প্রশাসনের কোনো একটি বা দুটি বিভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ উচ্চবর্ণের প্রভাবশালীর স্বার্থরক্ষার জন্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মেয়েদের নির্যাতনের ঘটনা চেপে দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু হাথরাসে দেখলাম, স্থানীয় থানা থেকে জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, জেলা আধিকারিক, লুকিয়ে শব পোড়ানোর সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, মৃতদেহ পাহারারত কনস্টেবল—সবাই একই সুরে কথা বলছেন, ডিএম যখন পরিবারকে বয়ান বদলানোর হুমকি দিচ্ছেন এবং পুলিশ সুপার যখন বলছেন, কিছু পুড়ছে না—তখন অবাক হয়ে দেখি ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রের কাছে রাষ্ট্রশক্তির এক নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ।

এবার আসি আমাদের রাজ্যে। মধ্যমগ্রাম থেকে কামদুনি, পার্কস্ট্রিট থেকে ধূপগুড়ি, রানাঘাট থেকে কাকদ্বীপ, ধূলাগড় থেকে কাটোয়া—একের পর এক ধর্ষণ ঘটে গেছে এবং এখনও চলছে। মধ্যমগ্রামের সঙ্গে হাথরাসের মিল পাবেন। পার্কস্ট্রিটকাণ্ডে সুজেটকে শাসকদলের সাংসদ কলগার্স বলেছিলেন, কাকদ্বীপের কিশোরীটির বেলায় বলা হয়েছিল, ও তো সিপিএম করে। তাই রাজনৈতিক বচসার ফল। আর কামদুনি গণধর্ষণ ও হত্যা সারা দেশের ঘটা ঘটনাগুলির মধ্যে নৃশংসতম বললে অত্যুক্তি হবে না। উত্তরপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ এগুলো আসলে একই রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতির বিকৃত মিলিত ফলাফল। দিল্লী থেকে মধ্যমগ্রাম থেকে হাথরাস—প্রতিটি মেয়েই বাঁচতে চেয়েছিলেন। জীবনীশক্তির শেষ বিন্দু জুড়ে জুড়ে লড়ছিলেন। যে সমাজ তাদের বাঁচতে দিল না সেই সিস্টেমকেই আমাদের প্রশ্ন করতে হবে। অত্যাচারিত হওয়ার পরেও যারা বেঁচে যাচ্ছেন, তাঁদের মনের জোর বাড়াতে হবে। অসংখ্য রেপ সার্ভাইভার আমাদের দেশে মাথা উঁচু করে বাঁচেন। অগুনতি অ্যাসিড সার্ভাইভার আয়নাকে প্রতিদিন চ্যালেঞ্জ জানান। আমাদের প্রতিবাদের ভাষায় তাঁদের পায়ের তলার মাটি যাতে শক্ত হয় সে খেয়াল রাখতে হবে।

বলছিলাম সিস্টেমটাকে প্রশ্ন করতে হবে। এখানে কোনো দ্বিচারিতা চলবে না, যদি আমরা ভাবি ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়া উচিত তাহলে হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ব্রাহ্মণ-দলিত মানবো না কেন? আমি ধর্মীয় বিভেদ মানি না কিন্তু লিঙ্গ বৈষম্য মানি। আমি লিঙ্গ সাম্য মানি আবার হিন্দু রাষ্ট্রও চাই। এগুলো একসাথে হয় না। তাই এই দলিত মেয়েটির গণধর্ষণে শোক প্রকাশের সময় এই প্রতিজ্ঞাই করি যে রাষ্ট্রব্যবস্থা মনুবাদী ও সামন্তবাদী মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছে সেই ভারতীয় গণতন্ত্রকে সংবিধান বর্ণিত সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে পুনরুদ্ধার করে গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধ পরিকর। ◻

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

সাধারণ সম্পাদকের আবেদন

কেন্দ্রিক প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ২০১১ সালের পরবর্তী পর্বে পূর্বেই উল্লিখিত প্রশাসনিক হিংস্রতার কারণে কর্মচারী বন্ধুদের ধর্মঘটে অংশগ্রহণের সংখ্যাগত কিছু তারতম্য ঘটলেও সাধারণভাবে ধর্মঘটের প্রতি কর্মচারী সমাজের দায়বদ্ধতা এখনও অটুট। এমনকি প্রশাসনিক হুমকি ও ফতোয়ার চাপে, যাঁরা ধর্মঘটের দিন দপ্তরে উপস্থিত থাকতে বাধ্য হন, তাঁরাও একান্তে ধর্মঘটের দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেন। স্বভাবতই এবারেও ধর্মঘট বিরোধী সমস্ত ধরনের প্রচার, ধর্মঘটের গুরুত্বকে লঘু করে দেখানোর প্রবণতা প্রভৃতির মোকাবিলা করেই ধর্মঘটের আহ্বায়ক বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তাদের প্রচার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। আমাদের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না।

২৬ নভেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রচারের বিশ্বায়ন পর্বের চিরাচরিত টানাপোড়েন, বেশ কিছুটা বাড়তি মাত্রা গ্রহণ করবে। কারণ ধর্মঘটটি অনুষ্ঠিত হবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেই। ধর্মঘটের ডাক এলেই রে রে করে ধর্মঘট বিরোধী যে প্রচার শুরু হয়, তা এবারেও থাকবে। সঙ্গে যুক্ত হবে একটি অতিরিক্ত প্রসঙ্গ। তা হলো, দেশের অর্থনীতি এখনও লকডাউনের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে ধর্মঘট ডাকা মানে তো মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই নেতিবাচক প্রসঙ্গটিই কিন্তু প্রকারান্তরে বর্তমান সময়ে ধর্মঘট ডাকার আবশ্যিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। কারণ এই প্রচার সারফেসে এলেই শ্রমজীবী মানুষ তাদের প্রচারে (আমরাও) যে প্রশ্নগুলি তুলতে পারবে, তা হলো—(১) কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়া লকডাউন ঘোষণা করা হলো কেন? (২) লকডাউন আকাশ থেকে পড়েনি। লকডাউন ঘোষণা করেছিল সরকার। তাহলে, দেশের শ্রমশক্তির ৯৪ শতাংশ, যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত, তাদের রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ার দায় সরকার গ্রহণ করলো না কেন? (৩) বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী কেন গরীব নিরন্ন, নিঃস্ব পরিবারগুলোর কাছে খাদ্য ও অর্থ পোঁছে দেওয়া হলো না? (৪) কেন পরিযায়ী শ্রমিকদের অপরিসীম দুর্দশা থেকে সরকার মুখ ঘুরিয়ে থাকল? কেন তাদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থাটুকু করা গেল না? মরিয়া হয়ে ঘরে ফিরতে চাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে যারা পথ দুর্ঘটনায় বা দিনের পর দিন অভুক্ত থাকার কারণে পথেই মারা গেলেন, কেন তাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য 'ডিজিটাল' ভারতের স্বপ্ন দেখানো সরকারের কাছে নেই? (৫) একটি বিষয় সমস্ত বিশেষজ্ঞরাই একমত, এবং তা হলো, লকডাউন জনিত পরিস্থিতিতে চাহিদার তীব্র সঙ্কটের কারণেই দেশীয় অর্থনীতি ভেন্টিলেশনে পৌঁছে গেছিল। তাই 'আনলক' পর্বে চাহিদাবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ছিল পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি। প্রয়োজন ছিল আয়কর বৃত্তের বাইরে থাকা পরিবারগুলোর কাছে নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়া। কেউ কেউ এমনও বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে টাকা ছাপাতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে অগ্রাহ্য করলো কেন? (৬) দীর্ঘ লকডাউনের কারণে দেশের শ্রমশক্তির একটা বড় অংশ জীবিকাচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও, আনলক পর্বে তাদের জীবিকার সংস্থান না করে, কেন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ এবং সাধারণ মানুষের অর্থ ও শ্রমে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজির মালিকদের হাতে ভেট দেওয়া হচ্ছে? (৮) দেশীয় অর্থনীতি যখন ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, তখন একমাত্র 'লাইফ সাপোর্ট' যা অর্থনীতির হৃৎস্পন্দনটাকে বন্ধ হতে দেয়নি, তা হলো কৃষি ক্ষেত্র। অথচ এই প্যানডেমিকের মধ্যেই গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির তোয়াক্কা না করে তাড়াহুড়ো করে আইন প্রণয়ন করে সেই কৃষি ক্ষেত্রকে দেশী-বিদেশী কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হলো কেন? এই প্রশ্নগুলির মধ্যেই কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে এবারের ধর্মঘটের সাত দফা দাবি।

এমন নয় যে হঠাৎ করে ধর্মঘট ডাকা হলো। বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সহ বিভিন্ন মহল থেকে বার বার বলা সত্ত্বেও মোদি সরকার দেশের অর্থনীতি তথা দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় এই সুপরামর্শগুলির প্রতি কর্ণপাত করেনি। তারা ব্যস্ত থেকেছে অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস ও দেশী-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজির সেবায়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বর্ধিরতাকে ভেদ করার জন্য ভগৎ সিং যেমন লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে বোমা বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তেমনই মোদি সরকারের বধিরতাকে ভেদ করার জন্য এই সাধারণ ধর্মঘট অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। দেশের প্রতি নিখাদ প্রেমেই ভগৎ সিংকে ঐ পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্দীপিত করেছিল। এবারের ধর্মঘটের ডাকও এমন নিখাদ দেশপ্রেম থেকেই। তাই আমরাও আমাদের সচেতনাকে দেশপ্রেমে জারিত করেই ধর্মঘটে অংশ নেব।

লড়াইটা মূলত কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে হলেও, রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ যদি কেন্দ্রীয় নীতির পরিপূরক হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধেও লড়াইটা একই সাথে পরিচালনা করতে হয়। না হলে, পায়ের তলার জমিটা শক্ত থাকে না।

কেন্দ্রীয় সরকার যখন শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারহীন করতে চাইছে, কেন্দ্রীয় দপ্তর ও সংস্থাগুলিতে বাধ্যতামূলক অবসরপ্রকল্প চালু করতে চলেছে, তখন আমাদের রাজ্যে প্রশাসনের অভ্যন্তরেও কর্মচারীদের অধিকার বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার অর্জিত অধিকারের অস্বীকৃতি, সংগঠন, আন্দোলন ও ধর্মঘটের অধিকারের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় সাত দফা দাবির সাথে, নিজস্ব দু'দফা দাবিকে যুক্ত করেই আমরা ধর্মঘটে যাব। ধর্মঘটের নোটিশ পাওয়ার পর, রাজ্য সরকার যদি মহার্ঘভাতার অধিকার, প্রতিহিংসা পরায়ণ বদলি ইত্যাদি সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে দাবিগুলি সমাধানে উদ্যোগী হয়, তাহলে আমরা বুঝবো রাজ্যের শাসকদলও শ্রমজীবীদের দেশপ্রেমিক লড়াইয়ের অংশীদার। নচেৎ, আমরা বুঝবো, মুখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেও, 'গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বয়'।

আসুন আমরা প্রস্তুত হই, ২৬ নভেম্বর দেশের মানুষের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার যোগ্য জবাব দিতে। ঐদিন রাজ্য সরকারের ভূমিকা কাদের হাত শক্ত করবে? কেন্দ্রীয় সরকার না শ্রমজীবী মানুষের? তা দেখার অপেক্ষায় রইলাম (যদিও উত্তরটা সম্ভবত আমাদের জানা)। পরিস্থিতি যাই হোক, ধর্মঘটে আমরা যাবই। প্রয়োজনে বেতন কাটা ও ডাইস-ননের ক্ষতি স্বীকার করেই। ◻

করোনা সংক্রমণ কেড়ে নিল যেসকল সাথীদের প্রাণ
তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শোকজ্ঞাপন

আলিপুরদুয়ার ঃ ফণীভূষণ রায় (পেনশনার্স সমিতি)।

কোচবিহার ঃ বিকাশ রায় (পেনশনার্স সমিতি)।

দার্জিলিং ঃ বিষ্ণু চ্যাটার্জী (ডব্লু বি এম ও এ), প্রদীপ দাস (সার্ভে অ্যান্ড ড্রইং এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন), অবিনাশ মোদক (পেনশনার্স সমিতি)।

উত্তর দিনাজপুর ঃ নিখিল ভৌমিক (পেনশনার্স সমিতি)।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ নির্মল বিশ্বাস (সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি), শিপ্রা দাস (জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সভাপতি)।

নদীয়া ঃ পুষ্প প্রামাণিক (পেনশনার্স সমিতি), অধীর মণ্ডল (পেনশনার্স সমিতি), নিমাই বিশ্বাস (পেনশনার্স সমিতি), অপূর্ব চক্রবর্তী (পেনশনার্স সমিতি)।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভানুবালা রায় (নার্সেস এসোসিয়েশন), তপন সোরেন (পঞ্চায়েত যৌথ কমিটি), সুজয় ব্যানার্জী (পঞ্চায়েত যৌথ কমিটি), দুলাল রায় (পেনশনার্স সমিতি), গণেশ সাহা (পেনশনার্স সমিতি), পূর্ণেন্দু দাস (পেনশনার্স সমিতি)।

বাঁকুড়া ঃ সুনীল বরণ ঢক (বিষ্ণুপুর মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ)।

হাওড়া ঃ অরূপ মজুমদার (ডব্লু বি এম ও এ), বিশ্বনাথ মুখার্জী (ডব্লু বি এম ও এ), অসীম ভট্টাচার্য (পেনশনার্স সমিতি), কল্যানী সাহা (পেনশনার্স সমিতি), উমাকান্ত বোস (পেনশনার্স সমিতি), সনৎ সাঁতরা (পেনশনার্স সমিতি), চিত্তরঞ্জন মুখার্জী (পেনশনার্স সমিতি)।

বীরভূম ঃ কৌশিক চক্রবর্তী (জেলা কালেক্টরেট দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী)।

কলকাতা ঃ সুবীর দে (খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতি)।

হুগলী ঃ জয়ন্ত বণিক (ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন), ওঃ বেঃ), সীমা মাঝি (বাউরি) (সেকেন্ড এ. এন. এম), নিমাই পাল (ভেটেরেনারী ফার্মাসিস্ট), দেবব্রত রায় (পেনশনার্স সমিতি), সুনীল ভট্টাচার্য (পেনশনার্স সমিতি), সুকুমার ভড় (পেনশনার্স সমিতি), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (পেনশনার্স সমিতি), শ্যামসুন্দর মিশ্র (পেনশনার্স সমিতি), বীরেন্দ্রনাথ সরকার (অবসরপ্রাপ্ত), সজলকান্ত ভট্টাচার্য (অবসরপ্রাপ্ত)। ◻

করোনার সময়ে ফুলে ফেঁপে ওঠা সামাজিক বৈষম্যের রাশ টানতে সাহায্য করবে ধর্মঘটের সাফল্য

শাশ্বতী মজুমদার

আগামী ২৬ নভেম্বর '২০২০ সারা ভারতজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হতে চলেছে। সর্বভারতীয় ৭ দফা দাবির সঙ্গে এ রাজ্যের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আরও ২ দফা দাবি সংযুক্ত করে মোট ৯ দফা দাবি নিয়ে আমরা ধর্মঘটে সামিল হতে চলেছি। এই ৯ দফা দাবিতে কোথাও আলাদা করে মহিলা, সংখ্যালঘু, দলিতদের বা সমাজের অন্যান্য দুর্বল অংশের জন্য কোনো দাবির উল্লেখ নেই। সেই অর্থে থাকবার কথাও নয়, কারণ এই ধর্মঘট আহ্বান করেছে দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি এবং মধ্যবিত্ত কর্মচারী ফেডারেশনগুলি (কেন্দ্রীয় সরকার এবং এ রাজ্যের সরকারের পেটোয়া দু-একটি শ্রমিক সংগঠন (?) ব্যতিক্রম)। কিন্তু তাদের এই দাবি সনদ যে আজকের করোনাপীড়িত ভারতে একেবারে প্রান্তিক মানুষ থেকে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত সর্বস্তরের জনগণের জীবন যন্ত্রণাকে সংগ্রামের ভাষায় অনূদিত করতে বদ্ধপরিকর তাই শুধু নয়, সমাজের সমস্ত দুর্বল অংশের মানুষের যে কণ্ঠস্বরগুলি সাধারণত চাপা পড়ে থাকে তাও ভাষা পেয়েছে এখানে। ফলে সমাজের নানা স্তরকে ছুঁয়ে দাবিগুলির অভিমুখ রচিত হয়েছে। তাই আগামী ধর্মঘটে সমস্ত মেহনতী মানুষের সংগ্রাম একটি ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে মাথা তুলে নীতি পরিবর্তনের জন্য দেশের বেপরোয়া সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবে, সেই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ক্ষুধা মারছে চাবুক

নয়া উদারনীতির তিন দশকে আগের ১৯টি ধর্মঘটের কোনোটিতেই দরিদ্রতম মানুষদের জন্য ক্যাশ ট্রান্সফারের দাবি ছিল না। বরং গণবণ্টন এবং অন্যান্য জনকল্যাণমুখী সরকারী কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার ওপরই বরাবর জোর দেওয়া হয়েছিল। কেন? কারণ ক্যাশ ট্রান্সফার কোনোদিনই গণবণ্টন ব্যবস্থা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, বিনামূল্যে শিক্ষা প্রভৃতির বিকল্প হতে পারে না, মনে করেন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদরা। খাদ্যসুরক্ষার বিষয়টি নিয়ে বামপন্থীদের সংসদের ভিতরে-বাইরে দীর্ঘকাল বিতর্ক, দীর্ঘকাল লড়াইয়ের ফলে জাতীয় কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের জন্ম হয়েছিল ইউ পি এ সরকারের আমলে, সে ইতিহাস আমরা ভুলে যাইনি। দারিদ্র্যসীমার নীচ থেকে বহু মানুষকে তুলে আনার বাস্তবতা সৃষ্টি করে এই প্রকল্প আন্তর্জাতিক স্তরেও স্বীকৃত হয়েছে। অথচ ছ'বছরের শাসনকালে কেন্দ্রের শাসকদল পরিকল্পিতভাবে জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ কমাতে কমাতে প্রকল্পটিকেই গুরুত্বহীন করে তুলেছে। ফলাফল? এই প্রকল্পে শ্রমবিদস কমেছে, মাথাপিছু গড় দৈনিক আয় প্রায় না বাড়ার মতো। ২০১৬-১৭ সাল এবং ২০১৭-১৮ সালে শ্রমদিবসের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩৫.৬৫ কোটি এবং ২৩৪.২৬ কোটি। পরিবার পিছু গড় কাজের দিন ক্রমশ কমছে—২০১৫-১৬-তে ৪৮.৮৫, ২০১৬-১৭-তে ৪৬.০০, ২০১৭-১৮-তে ৪৫.৭৮। ঐ দুই বছরে মাথাপিছু গড় দৈনিক আয় ছিল ১৬১.৬৫ টাকা ও ১৬৯.৪৬ টাকা। নারীদের ক্ষেত্র শ্রমদিবস মোট শ্রমদিবসের অনুপাতে ক্রমশ কমছে। ২০১৬-১৭ সালে ছিল ৫৬.১৬ শতাংশ, ২০১৭-১৮ সলে ছিল ৫৩.৪৬ শতাংশ। তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের ক্ষেত্রে শ্রমদিবসের শতকরা হার ২০১৬-১৭ সালে ছিল যথাক্রমে ২১.৩২ ও ১৭.৬২ এবং ২০১৭-১৮ সালে ছিল ২১.৪৮ ও ১৭.৬০। অর্থাৎ দরিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের থেকে সরকার যেন বাঁচার অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। একইভাবে এ রাজ্যের সরকারও মনরেগার কাজে নানা দুর্নীতি, শিথিলতা সহ নানা ভাবে অভিযুক্ত।

কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের হাতে কাজ না থাকলে, টাকা না থাকলে, অর্থনীতির চাকা সামনের দিকে কিছুতেই ঘুরতে পারে না। কয়েকজন বিলিওনেয়ারের টাকার পাহাড় আকাশচুম্বী হলেও বা মুকেশ আম্বানির সম্পদ প্রতি ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেলেও তাই আজ জি ডি পি-র ২৪ শতাংশ সঙ্কোচন ঠেকানো যায়নি। এই রক্তশূন্য অর্থনীতিতে ক্ষুধার ছোবল, নানা রোগের ছোবলে অতিমারির ছোবলে ক্ষতবিক্ষত দরিদ্রেরা। দরিদ্রদের মধ্যেও আবার নারী, শিশু, বয়স্ক ও অশক্ত, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালংগু মানুষরা বিশে বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে আয়কর বহির্ভূত পরিবারপিছু ৭৫০০ টাকা করে ক্যাশ ট্রান্সফারের স্টেরয়েড ছাড়া ভারতীয় অর্থনীতির অন্তর্জলি যাত্রা ঠেকানো যাবে না। সঙ্গে আছে ঐ পরিবারগুলিতে মাসে মাথাপিছু ১০ কেজি খাদ্যশস্য দেবার এবং মনরেগা প্রকল্পে বছরে ২০০ দিনের কাজ ও শহরে রেগা চালুর দাবি। নাছোড় সরকারের কাছ থেকে এই দাবি আদায়ের আর কোনো পথ আছে ধর্মঘট ছাড়া?

এই দাবিগুলি অর্জিত হলে তার ফল জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে নারী ও শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হবে সুদূরপ্রসারী। সম্প্রতি বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে প্রকাশিত হয়েছে ভারতের অবস্থান প্রতিবেশী পাকিস্তান ও বাংলাদেশেরও নীচে। ভারত সরকার আত্মশ্লঘা বোধ করতে পারে যে তারা অন্তত আফগানিস্তান বা রোয়ান্ডার ওপরে! দেখা যাচ্ছে ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিক শিশুদের অর্ধেক অপুষ্টির শিকার। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে বয়স অনুযায়ী বৃদ্ধি হয়নি ৩৭.৪ শতাংশের এবং বয়সের তুলনায় উচ্চতা ও ওজন উভয়ই কম ১৭.৪ শতাংশের। পাঁচ বছর বয়সের আগেই মারা যায় ৩.৭ শতাংশ শিশু, মূলত ডাইরিয়া, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি ছাড়াও জন্মের সময়েই কম ওজনের জন্য। শিশু ও প্রসূতি মায়ের অপুষ্টি, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যু, নারীদের রক্তাল্পতা ইত্যাদি রোধে খাদ্যের প্রয়োজন, বিশেষ করে সুষম খাদ্যের। পরিবারে নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষেত্রে যে খাদ্যের বৈষম্য তা এই দাবিগুলি অর্জিত হলে তা অনেকাংশে কমবে।

ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে

শ্রম কোড আইন এবং যে কৃষি বিলগুলি সংসদে জোরজবরদস্তি করে পাশ করানো হয়েছে, তা শুধু শ্রমিক বা কৃষকদের শোষণের রাস্তা খুলে দিয়েছে তাই নয়। শিল্প বা কৃষি ক্ষেত্রে যে মহিলারা যুক্ত তাদের ওপর আগে থেকেই নানা ধরনের বৈষম্য থাকায় এখন তাদের ওপর শোষণ আরও বাড়বে বলাই বাহুল্য। মজুরির বৈষম্য, যৌন হেনস্থা ও নির্যাতন, মাতৃত্বকালীন ছুটি না পাওয়া, গর্ভবতী হলে কাজ হারানো, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য হওয়া, কাজে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ কম পাওয়া, সামান্য কারণেই ছাঁটাই—এসব সমস্যা বহুগুণ বাড়িয়ে শ্রমিক বা কৃষক নারীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। যে সমাজে নারীরা এমনিতেই সম্পত্তির অধিকারে বঞ্চিত, সেখানে শ্রমিক বা কৃষক পরিবারের রমনীরা নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে অনেক বেশি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সঞ্চয় হারিয়ে নিঃস্ব হবেন। ভ্রান্ত সরকারী নীতির কারণে কৃষিতে সঙ্কট, ঋণগ্রস্ত হয়ে কৃষকদের আত্মহত্যার মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। আত্মহননকারী কৃষকের পরিবারের স্ত্রী সন্তানদের জীবনের অন্ধকার তত আলোচনায় আসেনি। দারিদ্র্যের নারীকরণ আগে থেকেই আছে, তা আরও ভয়াবহ রকম গভীর হবে নতুন আইন যদি রদ না করা যায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বেসরকারীকরণের আঁচও সবচেয়ে বেশি ভোগ করবেন মহিলারাই। মনে রাখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারী যে কর্মচারীর ওপর বাধ্যতামূলক অবসর নীতি এ পর্যায়ে প্রথম প্রয়োগ হয়েছে তিনি একজন মহিলা। তাই এইসব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মহিলাদের সচেতন হবার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশি। শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও সার্বজনীন পেনশনের দাবি অর্জিত হলে বয়স্কদের আর্থিক সুরাহা, মৃত শ্রমিকদের পরিবার ও কাজ হারানো বন্ধ কারখানা বা চাবাগিচার শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা, শ্রমিক পরিবারের অসুস্থ ও অশক্তদের চিকিৎসা, শিশুদের সহায়তা প্রদান প্রভৃতি সাহায্য পেতে পারবেন বহু বিপন্ন মানুষ।

প্রশ্ন হলো করোনাজনিত নতুন পরিস্থিতিতে উঠে আসা এই দাবিগুলি কি পারবে এই একই সময়ে নারীদের ওপর, সংখ্যালঘুদের ওপর, দলিতদের ওপর যে নতুন ধরনের নতুন মাত্রার আক্রমণ শুরু হয়েছে তাকে আটকাতে? উত্তর হলো, অনেকাংশে পারবে।

প্রথমত, ধর্মঘটের দাবিগুলি যে অর্থনৈতিক, সামাজিক বিষয়গুলিকে স্পর্শ করেছে তা মহিলাদের, বিশেষত শ্রমজীবী মহিলাদের, আজকের অর্থনৈতিক সমস্যার কিয়দংশের সমাধানের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের সামাজিক নিপীড়নের ফাঁস কিছু পরিমাণে আলগা করতে পারে নিশ্চিতভাবেই। কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক নিপীড়ন একে অপরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে। যদিও তার মানে এই নয় যে শুধু অর্থনৈতিক সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করলেই সামাজিক নিপীড়নের সব বাধা কাটিয়ে ওঠা যায়। করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় শুরু থেকেই 'ছায়া অতিমারি'র প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। করোনা অতিমারি গৃহবন্দী জীবনে হঠাৎ করে গার্হস্থ্য হিংসার এই ফুলে ফেঁপে ওঠা আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। গার্হস্থ্য হিংসা আগে থেকেই থাকলেও লকডাউনের সময়ের অর্থনৈতিক সঙ্কট, কর্মহীনতার হতাশা, মানসিক বিপর্যয় হিংসার পরিস্থিতিকে চরম জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করার মধ্যে দিয়ে সামাজিক হিংসার পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সাহস ও আত্মবিশ্বাস মহিলারা অনেকটাই পেতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, শ্রমজীবী মানুষের ওপর অর্থনৈতিক আক্রমণ সংঘটিত করার লক্ষ্যে এই সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ করছে। একই সঙ্গে তারা অত্যন্ত আগ্রাসীভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবিরোধী এবং পশ্চাদমুখী ধ্যানধারণা প্রসারে সক্রিয়। এই সবগুলিই কোনো না কোনো ধরনের হিংসার প্রসার ঘটায় যার কোনোটার অভিমুখ লিঙ্গভিত্তিক, কোনোটা সাম্প্রদায়িক, কোনোটা জাতপাতভিত্তিক প্রভৃতি। গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ ও প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে গিয়ে তারা এই কঠিন সময়ে বহু মানুষকে কারারুদ্ধ করেছে যাদের মধ্যে মহিলারাও আছেন, গর্ভবতী মহিলাকেও নিষ্কৃতি দেয়নি। তেমনই করোনা আগে থেকেই সংখ্যালঘু বা দলিতদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চলছিল তা করোনার সময়ে আদৌ কমেনি বরং সামাজিক দূরত্বের অজুহাতে ভেতরে ভেতরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা ও হিংসা বাড়িয়ে তুলেছে। কন্যা ভ্রূণহত্যার মতো জঘন্য অপরাধ রোধ করার আইন সাময়িকভাবে লঘু করে দেওয়া এরকমই একটি হিংসার প্রকাশ যা সরাসরি সরকারী হস্তক্ষেপের মধ্যে দিয়ে ঘটেছে। আবার সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের হাথরাসে দলিত কন্যা মনীষা বাল্মীকির গণধর্ষণ ও হত্যা, পশ্চিমবঙ্গের ডেবরায় আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ করে খুনের ঘটনা সাম্প্রতিক কালের দুটি উদাহরণ যেখানে যথাক্রমে বিজেপি ও তৃণমূল সরকারকে অপরাধীর পক্ষে দাঁড়িয়ে মৃতার পরিবারের সুবিচার পাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিতে দেখা গেছে। সরকার এবং শাসকদল এসব ক্ষেত্রে দুর্বলের রক্ষার পরিবর্তে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েছে দুর্বলের ওপর ঘটিত হিংসায়। সম্প্রতি আসাম হাইকোর্ট বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার একটি রায়ে স্ত্রী সিঁদুর না পরার জন্য স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করেছে। তামিলনাড়ুতে সম্মান হত্যার ঘটনায় উচ্চবর্ণের অপরাধীদের বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট পরিবারের সদস্যদের কাছে সম্মান হত্যার হুমকির মুখে থাকা দুই ভিন্ন ধর্মের স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মপরিবর্তনকে অবৈধ বলেছে। এসবের মধ্য দিয়ে নারী, সংখ্যালঘু, নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি সামাজিক বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করছে গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলি।

শাসকদের নিয়ম হলো তারা আক্রমণ এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে প্রসারিত করে। প্রতিরোধীদের ক্ষেত্রেও তাই। প্রতিরোধের লড়াই এক জায়গায় জমাট বাঁধলে লড়াইয়ের চেতনা অন্য ক্ষেত্রগুলোকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, ২৬ তারিখের ধর্মঘটের মাধ্যমে মেহনতী মানুষ দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক বাতাবরণ, স্বাধীন বিদেশনীতি রক্ষার জন্যেও নিজেদের শক্তি সংহত করবে তেমনই সেই সংগ্রামের পথেই সামাজিক বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কেও তারা সুদৃঢ় অবস্থান নেবার পথে অগ্রসর হতে পারবে।

এই রাজ্যের মহিলা কর্মচারীদের দায়িত্ব

এরাজ্যের সরকার প্রতিহিংসা ও হয়রানিমূলক বদলির মাধ্যমে প্রশাসনে ত্রাস সৃষ্টি করে রাজ্য কর্মচারীদের প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে এবং কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার অধিকারই কেড়ে নিতে চেয়েছে, এই দুটি ক্ষেত্রেই মহিলা কর্মচারীরাও সমানভাবে আক্রান্ত। তাই রাজ্য সরকারী দপ্তরে দপ্তরে সমস্ত কর্মচারীদের কাছে ধর্মঘটের দাবিগুলি নিয়ে প্রচার-আন্দোলন গড়ে তোলার সময় আমরা যেন ভুলে না যাই পিতৃতান্ত্রিক বাধা মহিলাদের লড়াই সংগ্রামে শামিল হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, কিন্তু শাসকের রক্তচক্ষু থেকে সেজন্য তারা রক্ষা পায় না উপরন্তু পিতৃতন্ত্রের বোঝা তাদের ঘাড়ে আরও জোরে চেপে বসে এবং শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক আন্দোলনের শক্তি তাতে খর্ব হয়। এই সচেতনতা নিয়ে মহিলা কর্মচারীদের ২৬ নভেম্বর ধর্মঘটের আহ্বানে সাড়া দিতে হবে, এটাই আজ সময়ের দাবি। □

আবেদন

প্যানডেমিকের কারণে ২০২০-২১ গ্রাহক বর্ষে সংগ্রামী হাতিয়ার নিয়মিত প্রকাশনা বিঘ্নিত হয়েছে। লকডাউনের পর জুন মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে ই-সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। অক্টোবর সংখ্যা থেকে ই-সংস্করণের পাশাপাশি মুদ্রিত আকারেও পত্রিকা প্রকাশিত হবে। জেলা / অঞ্চল / সমিতিগুলিকে মুদ্রিত সংখ্যার চাহিদা জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।